দ্বিতীয় অধ্যায়

নৃত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস

পাশ্চাত্যে ও ভারতে

' নিকোস কাজানজাকিস্ ' তাঁর বিখ্যাত বই ' জোরবা দ্য গ্রীক এ অ্যালেক্সি জোরবার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ননা করেছেন এই ভাষায় যে যখন জোর্বা ভাবের প্রকাশ করতে ভাষার বর্ননায় ব্যর্থ হতো তখন সে লাফাত বা অন্য ভাষায় উন্মাদ-ভাবে নাচত । এর বর্ননায় জোর্বার মুখ দিয়েই লেখক বলিয়েছেন ' ' আমি কি করতে পারি মালিক ? আনন্দে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত । কিছু তো করা দরকার । কিন্তু কি করবো ? কথা ? ঘোড়ার ডিম ' '

নৃত্যশিল্পের একেবারে গোড়ার কথাটাও তাই । প্রাচীন কাল থেকেই আনন্দ উচ্ছাসের বহিপ্রকাশ ঘটছে ভাবে ভঙ্গিতে সুতরাং নাচের উৎস যে সুদূর অতীতে একথা একেবারেই অনস্বীকার্য । পুরাকালের সংস্কৃতি, সাহিত্য বিচার করলে এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমান মেলে । যেমন প্রাচীণ শাস্ত্রীয় ঘরানার । ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির উল্লাসিত নাচের কথাই ভাবা যাক ।

আবার নৃত্য ও সংগীতের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতির প্রাক ইতিহাস ও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে রোগমুক্তির ক্ষেত্রে সুরের যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ' ওল্ড টেষ্টামেন্টের সেই অংশের যেখানে ডেভিড হার্প বাজিয়ে রাজা সিউলকে তার বিষন্নতার থেকে মুক্ত করছে। যে বিষন্নতা আসলে এক অশুভ আত্মার প্রত্যক্ষ প্রভাব মুক্ত ।

খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের সাথে সাথে এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী সংস্কৃতির অবদমন ঘটতে আরম্ভ করে কারণ এই সংস্কৃতি দেবীপূজা কেন্দ্রীক হওয়ার

Ref. (I) Samuel 16., 14-16, 23

জন্য নিরাকারবাদী খৃষ্টরা সরাসরি বিরোধীতায় নামেন। এসত্ত্বেও এই ধারায় নাচ বেঁচেছিল অন্য নামে ও পরিবর্তিত রূপে। দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন রাজ-সভার প্রভাব বাড়তির দিকে তখন নাচের এক নূতন ধারার জন্ম হয়। এসময়ে নাচ অভিজাত সম্প্রদায়ের সামাজিক কার্যকলাপের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে আরম্ভ করে বিশেষ করে বিবাহোৎসবে নাইট ও অন্যান্য সুন্দর রমনী-রা গানের সাথে বাঁশী ড্রাম ইত্যাদি সহযোগে সারিবদ্ধ অবস্থায় নাচত। আবার ব্যারণদের সভায় নাচের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন জায়গায়। এরকম সভায় নর্তক নর্তকীরা পরস্পরের হাত ধরে নির্দেশকের নেতৃত্বে সুন্দর ছন্দে নৃত্যপ্রদর্শন করত। ধীরগতির এই নাচের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সভার সম্মান ও প্রভাব বাড়ানো। নাচের সময় সঙ্গিরা চক্রাকারে লাইন ভেঙে এগিয়ে যেত আবার সুনির্দ্দিষ্ট ছন্দ ও লয়ে ফিরে আসত পূর্বাবস্থায়। এই সমস্ত নৃত্যাংশের নাম ছিল ফরাসী কিংবা বোহেমিয়ান ধাঁচের কিন্তু এর খ্যাতি ছিল মূলতঃ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার কারণে। পুরানো একটি কবিতানুসারে এই নৃত্য সম্ভবত বারোজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং তা সম্ভবতঃ কোয়াড্রিল ধাঁচের হ'তো। নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিমার ও নিয়মে বাঁধা এই নাচ নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

এই স্বতঃস্ফূর্ত ও দেশজ গ্রাম্য নাচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিজাত মহলেও প্রভাব ফেলেছিল। ১৪ শতকের বিশুদ্ধ অঙ্গিকের নাচের সঙ্গে এই দেশজ নাচের মিশ্রণ খুব প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিবেশের শেষদিকে অভিজাত ও বনিক সম্প্রদায় নিজেদের সুবিধামত শহুরে নাচের প্রচলন করে। ধনী পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশিত হওয়া একটি প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়ে যায় এবং এই আসরগুলিতে নির্দ্দেশক ও উপস্থাপক হিসাবে শুধুমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই উপস্থিত থাকত। এই আসরগুলি ব্যয়বহুল হতো এবং প্রাণময়তাও ছিল কম। এই সমস্ত অনুষ্ঠানিক নাচগুলিতে ফএসঙ্গীতের ব্যবহারের যে চরিত্র লক্ষ করা যায় তাতে এর সংগীতময়তাকে একাদশ শতকের ফরাসী গীতিকবিতার উত্তরসূরী বলা যায়।

যেহেতু বিবাহউৎসব খুব আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতো সেই কারণে শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার জন্য বিশেষ ধরনের নাচের উদ্ভব হয়েছিল। প্রারম্ভিক নৃত্যানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হ'তো বরকনেকে অভিনন্দন জানানো ও ভোজ সভার আয়োজনের মধ্যবর্তী সময়ে। এই নৃত্য অংশগ্রহণের নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট প্রথায় বাঁধা ছিল। এবং এই নিয়মাবলী মানা হতো সন্ধ্যাকালীন মশাল নৃত্যের ক্ষেত্রেও। এই নৃত্যের পরিচারক পরিচারিকারা মালা নিয়ে সুনির্দিষ্ট ক্রমে অংশ গ্রহণ করতো এবং এতে যাবতীয় বাসন কোসন ব্যবহার করা হতো।

চোদ্দশতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব মহামারীর আকার ধারণ করায় এর প্রভাব নাচের ক্ষেত্রেও পড়ে। মহামারীর ভয় কাটিয়ে উঠতে চেয়ে সাধারণ মানুষ ও নর্তকেরা দলে দলে' রাইনল্যাণ্ডে' জড়ো হতে থাকে। এবং এরা উদ্দাম নৃত্য প্রদর্শন করত যতক্ষন না সেই নাচ তাদের ক্লান্ত ও আচ্ছন্ন করে তুলতো। কালক্রমে এরা সেন্টজোন বা সেন্ট ভিটাসের নর্তক হিসাবে পরিচিত হয়। কেননা এদের নৃত্য ভঙ্গিমার সাথে স্ট্রাসবুর্গের (১■১৮) সেন্টভিটাস' গীর্জার রোগ সারানোর জন্য যে ঝাঁড়ফুঁক প্রথার প্রচলন ছিল তার সাদৃশ্য ছিল।

তৎকালীন কারুশিল্পীদের স্বর্ণযুগে একটি প্রথাছিল যে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সময়ে তারা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, ছাত্র সকলে মিলে শোভাযাত্রা করতো নৃত্য সহযোগে। বিভিন্ন কারুশিল্প, ব্যানার, পানপাত্র এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিসে সাজিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের পথে পথে ঘুরতো এবং খোলা আকাশের নীচে নৃত্য প্রদর্শিত হ'তো। মিউনিখের মদ বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার্য পীপার কারিগররা যে বিশেষ নাচটি প্রদর্শন করে দেখাত তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নৃত্যের মাধ্যমে তাদের অধীত বিদ্যাকে শিল্প সম্মত ভাবে উপস্থাপিত করা। প্লেগ পরবর্তী সময়ে ষোড়শ শতকে এই কারিগরদের নৃত্য উপস্থাপনার অরও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই যে সাধারণ মানুষের নীতিবোধকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো।

এই সময়ের মরিস নাচও আলোচিত হতে পারে। মধ্যযুগে এই নাচ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মরিস নাচের উৎপত্তির মূলে আছে একধরনের বিশেষ স্পেনীয় অভিনৃত্য যা মূর এবং আইবেরিয়ান উপদ্বীপের খ্রীষ্টানদের যুদ্ধকে চিত্রিত করতো। ইংল্যান্ডের রাজপুত্র ও স্পেনীয় রাজকন্যার বিবাহের ফলশ্রুতিতে এই নাচ ইংল্যান্ডে আরও প্রসার ও প্রচার লাভ করে পরবর্তী কালে।

বিভিন্ন উৎসবে ও সাধারণ আনন্দ উৎসবে হিসাবে মরিস নাচের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকের শেষদিকে সমগ্র জার্মানীতে এই নাচ যে প্রসার লাভ করেছিল তার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়, যদিও রূপ ও ভঙ্গিমা চরিত্রের অনেক বদল ঘটেছিলো। অবশ্য দক্ষিণ জার্মানীতে কিছু বিশেষ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এখনো এই নাচ অকৃত্রিম ও অবিকৃত ভাবে উপস্থাপিত হয়।

তবে এই সমস্ত জনপ্রিয় নাচগুলি কিন্তু এই একই সময়ের ফ্রান্স বা ইতালীর রাজসভায়, যদিও উপস্থাপনার ও নৃত্য ভঙ্গিমার রদবদলে এগুলি প্রায় ব্যালের আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল। ষোড়শ শতকেই দৃষ্টিনন্দন এই সমস্ত নাচ এতো জনপ্রিয় উঠতে আরম্ভ করে যে 'ক্যাথারিন দ্য মেদিচি' ফ্রান্সের রানী হবার পরে রাজপরিবারের সকলকে নিয়েই জাঁকজমক পূর্ণ ব্যালের প্রথম প্রযোজনা করেন। 'মেদিচির প্রযোজনায়' লা ব্যালে কমিক দ্য লা রেনি' - কে (La Ballet Comique De la Reine) প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও স্বার্থ ব্যালে। হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই ব্যালের প্রযোজনা করা হয়েছিল' মার্গারিত দ্য লোরেণ' এবং দ্যু দ্য জয়িয়ের বাগদান উপলক্ষে, সমগ্র অনুষ্ঠানটি পাঁচঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ হয়। এই ব্যালের কোরিও[illegible] ছিলেন এক বিখ্যাত ইটালীর নৃত্যশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীরা এসেছিলেন মূলতঃ রাজপরিবার থেকেই। এই ব্যালেটির সাফল্যের সাথে সাথেই পাশ্চাত্য নৃত্যের দুটি দিগন্ত উম্মোচিত হয়। প্রথমতঃ এই ধারার নৃত্য সমগ্র ইউরোপের রাজসভাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ নৃত্য শিক্ষক ও পরিচালকের সামাজিক মর্যাদার মাত্রার বদল হয়ে যায় [illegible] এই শিক্ষক ও কালক্রমে সভানর্তক হিসাবে পরিচিত হয়। ফ্রান্সে ব্যালে তেমনই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী সম্রাটদের মধ্যে দ্বিতীয় ফিলিপস, নবম চার্লস। তৃতীয় ও চতুর্থ হেনরী আর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুই নৃত্যের দক্ষতাকে

অর্জন করতে পেরেছিলেন । ফরাসী রাজদরবারে যে কোন সভাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় ছিল ব্যালে নৃত্যের অনুশীলন । ' মার্শাল দ্য ব্যাসমনিয়ের' এর মত বিখ্যাত যোদ্ধারাও বিভিন্ন অভিযানের ফাঁকে ফাঁকে নাচের আসরে আসতেন । ব্যালের উন্নতির জন্য । চতুর্দশ লুইএর অবদান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী কালে চতুর্দশ লুই শারীরিক কারণে নাচের আসার থেকে বিদায় নেন । এই সময় বোঁস নামে এক নৃত্য শিক্ষক সম্রাটকে কিছু পেশাদার নর্তক নিয়োগ করে ব্যালে নাচের প্রযোজনা করার পরামর্শ দেন কিন্তু সেইমত কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ান পেশাদার নর্তকের অভাব কেননা তখনও পর্যন্ত যারা ব্যালে নাচে অংশ নিতেন তারা কেউই নাচকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তবে সে সময়ের পেশাদারী নর্তকদের মধ্যে কিছু কিছু বাজীকর শিল্পিদিনের মধ্যেই ব্যালে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজন বোধে তারা দরবারী ঢঙের ব্যালের সাথে নানারকম বাজীকরী কৌশল সংযোজন করতে থাকেন । এরপর ব্যালে আর সৌখীন নর্তন নর্তকীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকল না । ১৬৬১ খ্রীঃ চতুর্দশ লুই ' লা - আকাদেমী ন্যাশিওন্যাল- দ্যা - দাঁস' প্রতিষ্ঠা করলেন , এই প্রতিষ্ঠান তৈরী করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পেশাদারী নর্তক তৈরী করা যারা এই শিল্পকে নিছক মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে না । দাঁসের প্রথম পরিচালক ছিলেন' জাঁ বাপ্টিষ্ট ল্যুলি' এবং পিয়ের বুচাম্প ছিলেন ব্যালে প্রশিক্ষক, এই শিক্ষায়তন থেকেই প্রথম পেশাদারী ব্যালেরিনা হিসাবে' লা ফনতাইন' এর আবির্ভাব হয়, এরপর থেকেই ব্যালে একটি স্বতন্ত্র কলা হিসাবে বিকাশ লাভ করতে আরম্ভ করলো - এই - ই হলো ফরাসী ব্যালে ইতিহাসের আদিপর্ব ।

শুরু থেকেই রাশিয়ায় নৃত্যকলার দুটি ধারা লক্ষ করা যায় - ভূমিদাস ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় দেশজ নাচ আর বিদেশী ভাব ধারায় পরিচালিত সভাকেন্দ্রীক নাচ, রাশিয়ায় ব্যালেতে প্রথম ধারায় নাচের প্রভাব ছিল বেশী । খ্রীঃ ১৭ শতক থেকে শুরু করে এই নৃত্যধারা এখনও টিকে রয়েছে । ১৬৭৫ সালে পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত (Slave Nymph)' স্লেভ নিম্ফ রাজকুমারী সোফিয়ার অংশগ্রহণের কথাও জানা যায় । ১৭০৩ সালে' পিটার দি

পেত্রুট যখন সেন্ট পীটার্সবার্গ প্রতিষ্ঠিত করলেন তখনই নৃত্যশিল্প সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। তিনি' বলনাচ' ও' কোরাস নাচ' প্রচলিত করেন এবং নাচের প্রসারের প্রসঙ্গে চার্চের বিরুদ্ধে যান। কারণ তৎকালীন ফ্রান্সে চার্চ এইসব নাচকে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বলে মনে করতো। এরপর ১৭২৫ সালে রানী' এ্যানের' রাজত্ব কালে' জঁ্যা ব্যাপটিস্ট লাদে' নামে এক ফরাসী রাশিয়ায় আসেন এবং দরিদ্র ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি শিক্ষালয়ের গঠন করেন। তার স্বপ্ন ছিল একটি রাজললিত কলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা। এই ফলস্বরূপ ১৭৪৩ সালে রাশিয়ায় পূর্নাঙ্গ নৃত্যকলা শিক্ষালয় গড়ে ওঠে পরবর্তী কালে রানী ক্যাথারীনের রাজত্বকালে এই নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন কঠোরতর করেন এবং ইম্পিরীয়াল থিয়েটারের প্রথম পরিচালক হিসাবে ' হিলফেরডিং' নামে এক অস্ট্রিয়কে নিযুক্ত করেন, ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত তিনি পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে একে একে আসেন যথাক্রমে ইতালীর ' অ্যানজিয়োলিণ্ট', ফুসানো, ক্যাকাভেল্লি এবং নোভেরীর প্রিয় ছাত্র চার্লস ল্যাপিক। প্রথম ব্যালে নৃত্য অনুষ্ঠানের শিল্পী তালিকায় একমাত্র রুশীয় নাম পাওয়া যায় ' ফুডোপকিনের' বাকী সবাই ছিলেন বিদেশী। আলোচ্য শতকের শেষে রাশিয়ার প্রথম কোরিও গ্রাফারের আবির্ভাব ঘটে তার নাম ইভান ভালবার্গ তিনি সম্পূর্ণ রুশ দেশীয় এক নৃত্য গীতনাট্যের সৃষ্টি করেন। রাশিয়ার প্রথম পেশাদার ব্যালে নৃত্যশিল্পী হিসাবে' মারিয়া ডানিলোভার' নাম উল্লেখ করা যায়। বিখ্যাত নর্তক ত্যুপোঁটের প্রতি তীব্র ভালবাসার পরিণতিতে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তখন তার সেই অমর প্রেম কাহিনী ব্যালে নৃত্যের উপজীব্য হয়ে পড়ে। তিনিই প্রথম' পঁয়েন্ট (Pointe) নামে ব্যালে নৃত্যের এক বিশেষ রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনজন বিদেশীর একজন ফরাসী, একজন সুইডেনবাসী এবং একজন ইতালীয় নাকি রাশিয়ার ব্যালে নৃত্যের স্রষ্টা। কিন্তু একথা ঠিক নয় কারণ এদের আবির্ভাবের পূর্বেই রাশিয়ার ব্যালের প্রবর্তন হয়েছিল। তবে এইসব শিল্পী রাশিয়ার নৃত্যশিল্পে তাদের অবদান রেখেগেছেন।

1 OCT 2002 [redacted]

পেশাদার ব্যালে নর্তকের অবির্ভাবের সাথে সাথেই পাশ্চাত্যের নৃত্যধারায় একটা বড় বদল ঘটে যায়। পুরানো ধারায় সভাকেন্দ্রীক নাচ যা শুধুমাত্র অভিজাত মহলের মানুষই প্রদর্শন করতো আর রসগ্রহণ করতো তার থেকে পরিবর্তিত হয়ে মঞ্চভিত্তিক শিল্পের মর্যাদা পেয়ে যায়। এই পর্যায় থেকে শিল্পীরা ব্যালে পরিবেশন করতো এবং দর্শক তার রস গ্রহণ করতো। অন্যান্য সমস্ত শিল্পকলার মতই ব্যালে নর্তকরা কঠিন শিক্ষারীতির মধ্য দিয়ে ব্যালের শৈলী ও নিপুনতা আয়ত্ব করতো এবং শারীরিক ভঙ্গিমার মাধ্যমে দর্শককুলের মধ্যে এক নতুন অন্তদৃষ্টির উদ্ভাবন করে রসগ্রহণে সাহায্য করতো। অবশ্য এই শারীরিক ভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির রাস্তায় গেছে। সতের শতক পর্যন্ত কোনভাবেই ব্যালে বলতে যা এখন বোঝা যায় তার আর্বিভাব হয়নি এমন কি' ল্যাকালটাইনে'-এর নাচের ভঙ্গিতেও পদক্ষেপেও সভাকেন্দ্রীক নাচের প্রত্যক্ষ ব্যবহার দেখা যেত। তার পোষাকের ব্যবহারেও সভাকেন্দ্রিক নাচের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮ শতকের শেষদিক থেকে ব্যালে শৈলীতে এই নতুন ভঙ্গি পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে এবং চরিত্রের আমূল বদল ঘটায়, এই ১৮ শতক থেকেই ব্যালের আধুনিক ইতিহাসের শুরু।

ভারতের নৃত্যের ইতিহাস

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে যুগ যুগ ব্যাপী দীর্ঘ। সঠিক ভাবে বললে প্রাগৈতিহাসিক সময়েও মানব সমাজে নৃত্যের যে প্রচলন ছিল সে প্রসঙ্গে যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। এমনকি ভারতে মানুষ যখন পর্যন্ত সভ্যতার মুখ দেখেনি তখনও নৃত্যের প্রচলন ছিল। এর প্রমান মেলে ভারত বর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক ও পরবর্তী সময়ের প্রাচীন গুহা চিত্রে।

"The known begingings of art in India have been pushed back 2000 years or more ..... The greatest efforts in studying the early art of South Asia has been devoted to 23 rock shelter regions in Central and South India. Most intensive analysis in recent years has focused on Bhimbetka, and adjacent central vindhyan hills in Madhya Pradesh ..... all the other known painted shelters in India"

মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা ছাড়াও ভূপালের বিমানবন্দরের নিকটবর্তী সিংগরচৌদিকার গ্রামের 'লাগোয়া' 'মালোয়াভান্ কী টেকড়ি' নামে যে পাহাড় রয়েছে সেখানে গোটাকুড়ি গুহায় একরকমের প্রাগৈতিহাসিক ছবির গ্যালারী খুঁজে পাওয়া গেছে। রায়পুর থেকে ১১৪ কিঃমিঃ দূরে চিতাভুরী পাহাড়ের গায়ে বেশ কয়েকটি মধ্যপ্রস্তরযুগীয় চিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে দু বছর আগে। শিপারীয়া শহরের কাছে পাঁচমারিতে মহাদেও পাহাড়ের গুহাগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রের গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উড়িষ্যার পশ্চিম সীমান্ত থেকে সামান্য কিছু দূরে মধ্যপ্রদেশের সিংহমপুরের পাহাড়ে প্রচুর পরিমানে মিলেছে প্রস্তর যুগের আঁকা ছবি। মধ্যপ্রদেশের শহরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের খুঁজে পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক চিত্র গুহার সংখ্যা কম নয়, উত্তরে কাশ্মীরের মহাদেও পর্বতে বুর্জোহোম শৃঙ্গে প্রায় ৪০০০ বছর আগে আঁকা গুহাচিত্র মিলেছে আবার সুদূর দক্ষিণে কর্ণাটক রাজ্যের রায়পুর শহরের কাছে বেনাকালের অরণ্যের মধ্যে ছোট এই পাহাড়ের গুহার মধ্যেও নানাধরনের আদিম জীবনচর্চার ছবি আঁকা রয়েছে। এর বয়সও কমবেশী হাজার আড়াই বছর। কর্ণাটকের বেলানাড়ী শহরের উপকণ্ঠে কুপুগালু নামে যে পাহাড় রয়েছে, ওড়িষার কালাহাণ্ডির যোগীমঠ পাহাড়েও খোঁজ মিলেছে বেশ কিছু আদিম চিত্রণের। উত্তরপ্রদেশের মীরজাপুরের আড়োওয়া শহরের কাছে লিখনুয়া পাহাড়ের ছোট ছোট গুহাগুলির গায়েও ইতিহাসপূর্ব সময়ের গুহা চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এরমধ্যে পাঁচমারী, ভীমবেটকা চমুলের ভিড়ি, কোটাপাহাড় ইত্যাদি জায়গায় গুহাচিত্রগুলিতে আদিম মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ

নাচের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গিমার চিত্রায়ণও রয়েছে এইসব নিদর্শন গুলিতে। এগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ উৎসব ভিত্তিক হলেও শীকার, যুদ্ধ, যাদু এ ধরনের বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ছবিও চিহ্নিত রয়েছে। সুতরাং সাধারণ ভাবে ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি এতো দীর্ঘ যে সে প্রসঙ্গে সম্যক ধারণা থাকা দরকার কেননা সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে ভারতের নৃত্য ইতিহাসে কোনও একটি বিশেষ ধারার উত্থান বা পতন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সমগ্র ধারার ক্রমবিকাশের মধ্যেই এর সঠিক ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে। ভারতীয় নৃত্যে মূলত তিনটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে —

যেমন —

১) আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ

২) লোকনৃত্যে গ্রামীন কৃষিভিত্তিক গণসমাজ

৩) উচ্চাঙ্গ নৃত্যে নগর কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবি সমাজ

এই প্রতিফলনের ফলে ভারতের নৃত্যধারার শ্রেনী বিন্যাসে কতগুলি লক্ষন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই লক্ষনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে ভারতের নৃত্য ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার নৃত্যের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ন তা বোঝা যায়।

আদিবাসী নৃত্য

ভারতের নৃত্য ইতিহাসে লোকনৃত্যের প্রভাব কতটুকু তাও এখানে আলোচনা করা দরকার। কারণ ভারতীয় নৃত্য যে স্থানীয় আদিবাসী সমাজের নৃত্যের প্রভাব পুষ্ট তা পূর্ববর্তী আলোচনার থেকে কিছুটা বোঝা যায় সুতরাং আদিবাসী সমাজ এবং লোকসমাজ উভয়ের পরস্পর সম্পর্কের কথা আলোচনা করে রাখা দরকার।

Annual Review of Anthropology Vol. 8 1779 P. 412

আদিবাসী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এতে বাইরের সাংস্কৃতিক উপকরণ গৃহীত বা অনুকৃত হয় না যেমন লোকসমাজে হয়ে থাকে। কিন্তু আদিবাসী সমাজ যেহেতু অঞ্চল ভিত্তিক এবং চরিত্রে কিছুটা অংশে যাযাবরধর্মী সেই কারণে আদিবাসী নৃত্য কখনই অপরিবর্তিত চেহারায় লোকনৃত্যের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। বিভিন্ন আদিবাসী নৃত্যই পরবর্তীকালে মিলে মিশে কোন একটি নির্দিষ্ট লোক নৃত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা লোক সমাজের বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সঙ্গে প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণের এই একই সম্পর্ক বর্তমান। আদিবাসী সমাজ অন্ধ অনুকরণবশতঃ নিজের সমাজ জীবনের উপকরণগুলি আঁকড়ে থাকে। একদিক দিয়ে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির মতো আদিবাসী সংস্কৃতি প্রতিটি খুঁটি-নাটি রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি হয় বলে তা কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্তও হয়। আজ যে ভারতব্যাপী আদিবাসী সমাজের নৃত্য এতো বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয় তার প্রধান কারণ বহুকাল যাবৎ এদের মধ্যে কোনও সাংস্কৃতিক উপকরণ বিনিময় হয়নি ফলতঃ প্রতিবেশী সমাজকেও এই সংস্কৃতি নতুন নতুন প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু একদিন আদিবাসী সংস্কৃতির উপকরণই লোকসংস্কৃতির অন্যতম অবলম্বন ছিল। এর জীবনীশক্তিই প্রতিবেশী লোক সমাজকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনই নিজে নিজের মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত আদিবাসী নাচের আচার অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষন করলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের নৃত্যকলার চরিত্রগত আভাস কিছুটা মেলে। অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাসের মধ্যেই নৃত্যকলার আদিম উৎস খুঁজে পাওয়া যায় কারণ আদিম নৃত্য কলার জীবন্ত ধারাগুলি বর্তমানে প্রচলিত আদিবাসী নৃত্যকলার মধ্যে বেঁচে আছে। আদিম নৃত্যকলায় সমষ্টিগত চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন নৃত্যে দর্শক ও শিল্পীদের মধ্যে কোনও আলাদা ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ হতো না এবং হতো না বলেই সমগ্র সমাজই এতে সমবেতভাবে যোগদিত। এই আদিবাসী নৃত্য থেকেই গোষ্ঠিগত শ্রুতিঐ পরম্পরায় ও স্থানীয় প্রভাবে লোকনৃত্যগুলি গড়ে উঠেছে। আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক উৎসব ধর্মীয় নাচের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। সময়গত দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে আদিবাসী নৃত্য ইতিহাস পূর্ব সময় থেকে প্রাক্‌বৈদিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

লোকনৃত্য :

বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ নানা আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে ভাঙতে ভাঙতে যেমন লোক সমাজে পর্যবসিত হয়েছে নানা স্তর পেরিয়ে তেমনই আদিবাসী সংস্কৃতি তথা নৃত্যকলা নানা রদবদল ও সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে লোক-সংস্কৃতি তথা লোকনৃত্য। সুতরাং নৃত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে আদিবাসী নৃত্য রূপান্তরিত হয়ে আধা লোকনৃত্যে পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে এই আধা লোকনৃত্য পরিমার্জিত চেহারা পেয়ে লোকনৃত্যের আঙ্গিক পেয়ে যায়।

আজ আমরা লোকনৃত্য বলতে যা বুঝি সে নাচ এ যুগের নগরের সৃষ্ট নাচ নয়। তাহলো ভারতের গ্রামে বহুদিনের প্রচলিত আর এক সমাজের নাচ। বৈচিত্র্যময়তায় নানামুখি হলেও আঙ্গিকে এবং শৈলীতে লোকনৃত্যে স্থান বিশেষে মৌলিক কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। মূলতঃ সমস্ত লোক নৃত্যই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যক্তিনির্বিচারে অংশ গ্রহণ লোকনৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লোকনৃত্যে শিল্পী অভিনেতা বা দর্শক এদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। লোক-নৃত্যের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ সমাজজীবনের বিভিন্ন দৈনন্দিন ঘটনার থেকেই উঠে আসে যেমন - খাবার সংগ্রহ, শীকার, মাছধরা, বীজবপন, ফসলকাটা এইসব বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপ কাজকর্ম সামাজিক প্রথা আচার লোকনৃত্যের প্রধান উপজীব্য। ভারতীয় উপমহাদেশে নানাজাতি, ভাষা, নৃতত্ত্বগত পার্থক্য, নানাধর্ম নানা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস ইত্যাদির কারণে আঙ্গিক ও শৈলীগত দিক থেকে লোকনৃত্যের ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যময়, ঠিকমত বলতেগেলে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাস্কর্য, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে নাচের যে অজস্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ভারতে কম করেও পাঁচহাজার বছর আগে থেকেই লোকনৃত্যের প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতার সময় কালের মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা

নারীমূর্ত্তি ও নানাশীলমোহর ও অন্যান্য ভাস্কর্য যেমন নর্তকের দেহকান্ত (হরপ্পা) দেখে বোঝা যায় যে সে সময়ও ভারতে লোকনৃত্যের প্রচলন ছিল। অবশ্য ওইসব মূর্ত্তি ও শীলমোহর ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষনালব্ধ তত্ত্বগুলিতে সে সময়ে লোকনৃত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের নৃত্য ঐতিহ্যের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে ভারতীয় নৃত্যশৈলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে এবং জটিল সাংস্কৃতিক ধারাকে বিশ্লেষণ করতে নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব যে কোন একটিই যথেষ্ট নয়। এগুলির সাথে পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক শৈলীকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। লোকআঙ্গিকের নাচ সর্বদাই পরিবর্তনশীল আর সেই কারণেই শুধুমাত্র প্রাচীনসমাজ কিংবা পরবর্তীকালের গ্রামীণ সমাজ বা আরও উন্নত সভ্য সমাজকে বিশ্লেষণ করে লোকসংস্কৃতির ধারা বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের সমগ্র আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে এবং বিভিন্ন রকমের আঙ্গিককে বিশ্লেষণ করা। আগেই বলা হয়েছে আজ আমরা লোকনৃত্য বলতে যা বুঝি তা এযুগের নগরসৃষ্ট নৃত্য নয়। ইংরেজের আমলে বহুদিন পর্যন্ত নাগরিক শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রকার নৃত্যকলা চর্চার যোগ্য বলে মনে করিনি। কিন্তু ইংরেজ আমলে যে সভ্যতার বিকাশ হয় তাতে পূর্বের গ্রামজাত সভ্যতার মত কোন সমাজের জন্যে নৃত্যের কোনও নতুন বিকাশ ঘটেনি। বহুদিন পর্যন্ত, যদিও লোকনৃত্য কথাটি আমরা পেয়েছি Folk dance শব্দটি থেকে। ইউরোপে ওই শব্দটির যে কারণে উৎপত্তি হলো আমাদের দেশে কিন্তু সেরকম কারণ গত ৩৫ বছর আগে পর্যন্ত ঘটেনি। ইউরোপের মত তখন পর্যন্ত নগরজাত সুতন্ত্র কোনও প্রাণবন্ত নৃত্যধারা এদেশে দেখা দেয়নি; সুতরাং আমাদের কাছে ভারতের গ্রামজাত বা সৃষ্ট সব নৃত্যই হলো লোকনৃত্য এই লোকনৃত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়, তার প্রথমটির উদ্দেশ্য হলো কেবল গ্রাম সমাজের চিত্ত বিনোদন ও গ্রামে লোক শিক্ষার প্রচার করা। তারজন্য সুতন্ত্র একদল শিল্পী তৈরী হয়েছে গ্রামে গ্রামে যুগে যুগে, সেই ধারারই উন্নততর সংস্করণ হলো আজকাল যাকে আমরা পার্শ্বীয় নৃত্য বলি তাই। গ্রাম সমাজে সকলের জন্য যে নৃত্য সেইই হলো দ্বিতীয় দলের। এটি কিন্তু অন্যের চিত্ত বিনোদনের জন্য নয় সকলের

সঙ্গে নিজের চিত্তবিনোদোন ও আনন্দ প্রকাশের জন্য । এখনও ভারতের গ্রামসমাজ এই দ্বিতীয় দলের লোকনৃত্যই সংখ্যায় অধিক প্রচলিত এবং সংখ্যায় ও বৈচিত্রে পৃথিবীর আর কোনও দেশ এর সমকক্ষ নয় । গ্রামের যুথ বা দলবদ্ধ বা সমবেত নৃত্যগুলি এই দ্বিতীয় দলের । আমাদের দেশে দলবদ্ধ নৃত্যের মধ্যে পুরুষ ও রমনীর পৃথক পৃথক নৃত্যই অধিক প্রচলিত । উভয়ের একত্রিত বা সমবেত নৃত্য সেতুলনায় খুবই কম, ভারতের কোনও কোনও পল্লী অঞ্চলে পুরুষ ও রমনীরা দলবদ্ধ হয়ে পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য প্রদর্শন করে কিন্তু তা হলেও ইউরোপের বিভিন্ন গ্রামীণ নৃত্যের মত প্রেমের অভিনয় তাতে নেই । প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাচীন ভারতে প্রেমের অভিনয় যুক্ত দলবদ্ধ নাচ ছিল বলেই তো ' শ্রীমদ্ভাগবতে' রাসনৃত্যের' বর্ণনা পাই । কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ' শ্রীমদ্ভাগবত' - এ এই নৃত্য হয়েছিল সমাজের চোখের আড়ালে, লুকিয়ে অর্থাৎ তা ছিল সমাজের নিয়মবহির্ভূত গোপন মিলনের নৃত্য । সেইজন্য এ ধরনের নৃত্য থাকলেও প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজে তা প্রচলিত ছিল বলে ঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না ।

ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না , কিন্তু প্রামান্য উপাদান ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে । শিলালিপি, তাম্রফলক, বিভিন্ন পান্ডুলিপি, মন্দির ভাস্কর্য ইত্যাদি বহুশতাব্দী ব্যাপী নৃত্য ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে । সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষনায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে । প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে মোটামুটি ভাবে খ্রীঃপূর্ব ৫০০০ বছর থেকে

খ্রীঃপূঃ ৩০০০ বছরের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার সময় নির্দিষ্ট করা যায়। হরপ্পা - মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ থেকে তৎকালীন ভারতের সমৃদ্ধ নগরজীবন ও পুরসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষ থেকে সে যুগের নৃত্যকলার নানা উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। এই উপকরণগুলি থেকে তৎকালীন সময়ে গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্যের অনুশীলনের কথা পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তির অঙ্গসজ্জা ও কেশবিন্যাস লক্ষণীয়। অলংকারের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে পরবর্তী সময়ের দেবদাসীদের সংগে কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আবার হরপ্পায় আবিস্কৃত - নর্তকের প্রস্তর মূর্তির (টর্সো) সাথে শিব বা নটরাজ মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মূর্তিটির মাথা হাত এবং পা ভাঙ্গা তবুও পায়ের ভঙ্গি বিশেষত: বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরের অংশের ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় বাঁপা মাটিতে ছিলনা সম্ভবত নাচের ভঙ্গিতে কিছুটা ওপরে তোলা ছিল।

হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে নৃত্যের প্রাচীনতম উল্লেখমেলে বৈদিক গ্রন্থাবলিতে যার রচনাকালের সময় সীমা খ্রীঃপূঃ ৫০০০ - ১০০০ বছর পর্যন্ত। এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মীয় নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন বিবাহ উৎসবে নাচ, কিংবা পারলৌকিক কার্যাদিতে নৃত্যের ব্যবহার, ঋকবেদে দেবী উষাকে বর্ননা করা হয়েছে সালংকারা সুন্দরী নর্তকী হিসাবে। বৈদিক সাহিত্যে তৎকালীন দেবদাসীদের প্রসঙ্গেও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

চারবেদছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো - 'ব্রাহ্মণ', 'আরণ্যক' এবং 'উপনিষদ'। মহাব্রত উৎসবের সময় কুমারীরা মাথার ওপর জলের কলসী নিয়ে পবিত্র আগুনের চারপাশে গোল হয়ে নাচতো যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃষ্টি আনয়ন। মহাব্রতে নৃত্যের এই ব্যবহারের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্য থেকেই পাওয়া যায়। সেসময়ে মেয়েদের কাছে নৃত্যশিক্ষা ঠিক কতটা কাম্য ছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্য বলছে : কোন নারীর প্রথম বিবাহ সোম-এর সাথে, তারপর গন্ধর্ব-র সাথে এবং তারপরে অগ্নির সাথে ; যার অর্থ হলো যে তাকে প্রাথমিক ভাবে সোমরস তৈরী করা জানতে হবে, পরে নৃত্যগীত শিক্ষা শেষ হলেই সে কোন এক পুরুষের উপযুক্ত হতে পারবে। অন্যান্য উল্লেখের মধ্যে পাওয়া যায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য রমণীর নৃত্য প্রদর্শনের কথা।

ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো রামায়ণ এবং মহাভারত রচনার কাল। এই দুটি মহাকাব্যতেই নৃত্যের অজস্র উল্লেখ আছে। এই উল্লেখগুলি থেকেই জানা যায় যে সে সময় নৃত্য একটি সৃষ্টিশীল কলা হিসাবে গণ্য করা হতো এবং নৃত্যানুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ ও রাজ পরিবার উভয়েই অংশগ্রহণ করতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অযোধ্যা নগরীতে চারটি প্রধান মণ্ডপ ছিল যার একটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উল্লেখ আছে রামচন্দ্রের জন্ম, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই নৃত্যগীত সহযোগে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়েছিল এবং এই উপলক্ষে পেশাদার নর্তক ও বাদ্যকারদের আহ্বান করা হয়েছিল। আবার লঙ্কারাজ রাবণ শিব বন্দনার সময় নিজেই নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন এমনকি তার নর্তকীরা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকত। এই সমস্ত নর্তকীদের মধ্যে একজনের দক্ষতা এমন পর্যায়ে ছিল, যে কথিত আছে ঘুমানোর সময়ও তার ভঙ্গিমা থাকত নৃত্যের মত।

মহাভারতের সময়ও যে সমাজে নৃত্যের স্থান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমস্ত জায়গাতেই নৃত্যশালার উল্লেখে। অর্জুনের নৃত্য পারদর্শিতারও উল্লেখ

পাওয়া যায় । মূল মহাভারতে নৃত্য সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ সে ভাবে পাওয়া যায় না তবে মহাভারত সম্পর্কিত অন্য একটি গ্রন্থ ' হরিবংশে' নৃত্য বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ।

পৌরাণিক সাহিত্যের রচনাকাল খ্রী : পূ : ১০০০ বছর থেকে শুরু করে খ্রীষ্টিয় ১০ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত বলে মনে করা যায় সাধারণভাবে । স্বাভাবিক ভাবেই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নৃত্যকলাও অনেক সুবিন্যস্ত শিল্প হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে । কিছু পুরানে নৃত্যের সরাসরি বর্ণনা আছে এবং 'অগ্নিপুরানেই ' নৃত্যশৈলী ও আঙ্গিকের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় । ' বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরানে' অনুসারে দক্ষ ভাস্করের প্রথমিক ভাবে দক্ষ চিত্রকর হওয়া প্রয়োজন, আবার দক্ষ চিত্রকরের অন্যতম শিক্ষনীয় বিষয় হলো নৃত্যকলা । অতএব এই সময়ে সমাজে নৃত্য একটি উচ্চকলা হিসাবেই গণ্য হতো । যদিও পুরানে নৃত্য সম্পর্কিত বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে আছে 'ভাগবতপুরানে', যা মূলতঃ কৃষ্ণের রাসলীলাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গুরুত্ব করে রচিত হয়েছে ।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ভারতের নৃত্য সম্পর্কিত একমাত্র শাস্ত্র 'নাট্যশাস্ত্র' রচিত হয় । এর রচয়িতা ভরতমুনী । সামগ্রিক ভাবে নাট্যশাস্ত্র ৩৬টি অধ্যায় সম্বলিত একটি রচনা যাতে মূলতঃ নৃত্যের প্রক্রিয়া ও ব্যাকরণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে । অবশ্য নৃত্য ছাড়াও কবিতা, গীতিকথা, নন্দনতত্ত্ব , মঞ্চ ইত্যাদি বিষয়ও নাট্যশাস্ত্রে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে ।

এইসব পৌরাণিক, ধর্মীয়, দর্শনশাস্ত্র রচনার পরবর্তী পর্যায়ে আসে সাহিত্য , অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন কবি ও নাট্যকারের মাধ্যমে রচিত হতে থাকে ক্লাসিকধর্মী সাহিত্যাবলী । এইসব কবি- নাট্যকারদের মধ্যে কালিদাস, ভাস ভাস এবং শূদ্রক অন্যতম মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । এঁদের রচনায় অর্থাৎ কবিতায়, নাটকে ভারতের তৎকালীন শাস্ত্রীয় নৃত্যের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ।

নাচের বর্ণনায় আঙ্গিক , শৈলী, পদ্ধতি প্রকরণ, পোষাক, অলংকার নর্তক - নর্তকীদের শারীরিক ও সৌষ্ঠব বর্ণনা সবই অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে । এমনকি সে সময়ের দর্শককুলের চারিত্রিক বৈশিষ্টেরও যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায় । কিছু রচনা, যেমন ' মালবিকাগ্নিমিত্র'-এ বিষয়বস্তু হল শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কিত । কেননা মুখ্য নায়িকা মালবিকা এক নৃত্য পটিয়সী । কাজেই নৃত্যের শিক্ষাধারা , উপস্থাপনা, ভঙ্গি , অভিব্যক্তির প্রকাশ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে , বিশদ আলোচনার প্রসঙ্গ এসেছে প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই । আবার অর্থশাস্ত্র বা কামসূত্রের মতো ক্লাসিক রচনায়ও নাচের উল্লেখ লক্ষণীয় । কামসূত্রে সুদক্ষা বারাঙ্গনাদের গুণাবলীর মধ্যে নৃত্য পটুত্বকে অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বসন্তসেনার কথাই এই সময় পাওয়া যায় ।

পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু সাহিত্যের পাশাপাশি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্যও রচিত হতে থাকে পালি বা সংস্কৃত ভাষায় । এসব সাহিত্যের রচনাকাল তিন শতক ও পরবর্তী সময় । এসব রচনায় ও সাময়িক ক্ষেত্রে নাচের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় । বুদ্ধের পূর্ব জন্মের গল্পাবলী অর্থাৎ জাতকের গল্পে নাচের উল্লেখ বিচ্ছিন্নভাবে আসলেও অপ্রতুল নয় । এই জাতকের গল্পের থেকেই জানা যায় যে সে সময়ে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে শোকপালনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে নাচ বা বাজিকরী ভঙ্গিমার প্রয়োগের প্রচলন ছিল । এই সময়ের বিখ্যাত বারাঙ্গনা আম্রপালীর চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে সে নৃত্যকলা ও সংগীতে পটুত্ব লাভ করেছিল । 'কুলবাজাতক', ' ভুম্বাচাজাতক', 'সুরুচিজাতক', 'কুশজাতক' ইত্যাদিতে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

জৈন সাহিত্যের রচনাকাল মূলতঃ খ্রীষ্টপূর্ব চার শতক থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় পাঁচের শতক পর্যন্ত । জৈন সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় বিধি । এই সমস্ত রচনায়ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিষয়ক উল্লেখ প্রমাণ্য হিসাবে মেলে ।

জৈনলিপি 'নয়াধর্মকহা-তে' 'চম্পা' নামে এক রমনীর নৃত্যগীত পটুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার এই পটুত্ব এমন পর্যায়ের ছিল যে প্রদর্শনের সম্মান মূল্য ছিল এক হাজার মুদ্রা । আবার 'উত্তরাধ্যয়ন ' গ্রন্থে 'সিন্ধুসবিরার রাজা উদয়ন তার স্ত্রীর প্রভাবতীর নাচের সময় বীনা বাজাতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় । এই সব সূত্রেই জানা যায় যে সে সময়ের ভারতীয় সমাজে নৃত্যগীত পটীয়সী দেবদাসী সামাজিক কাঠামোয় প্রায় অপরিহার্য ছিল । কোনো কোনো বিধিসূত্রে দেবদাসীর উল্লেখ আছে সুনির্দিষ্ট নামের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ও উল্লেখ আছে তাদের নৃত্য উপস্থাপনার বিবরণের মাধ্যমে ।

পরবর্তীকালে ওড়িশায় শৈবধর্মের উত্থানের সময়ে, খ্রীষ্টিয় তের শতকে রচিত 'একরাম পুরানে' ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত দেবদেবী মূর্তির মহিমা বর্ণনা করা হয় । এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শৈবধর্মের অন্যতম পূজ্য শিব ও দেবী (পার্বতী)র আরাধনায় দেবদাসীদের নৃত্য গীত উপস্থাপনা অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিলো । নৃত্যের বর্ণনায় যে সমস্ত ব্যবহৃত বাদ্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে বীণা, বেনু (বাঁশি), মৃদঙ্গ, ত্রিশিরা, ঝারিঝরা, কাঁসি, পটাহ প্রভৃতি । এই পুরানে শিবের বর্ণনা করা হয়েছে 'নৃত্যবিশারদ ' হিসাবে । অন্যান্য ওড়িয়াগ্রন্থাবলী যেমন 'স্বর্ণাদ্রি মহোদয়' , 'দুর্গোৎসব চন্দ্রিকা', ইত্যাদিতে নৃত্যের উল্লেখ আছে । ষোল শতকে রচিত নরসিংহসেনার 'পরিমালা কাব্যে' নৃত্য উপস্থাপনার সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে । প্রখ্যাত নর্তকী তিলোত্তমা এক বিবাহ উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করছে সেই বর্ণনা এখানে চিত্রিত হয়েছে । এই সুন্দরী নারীর ত্রিভঙ্গ মুদ্রার মাধ্যমে সাবলীল শারীরিক সঞ্চালনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় । বিবরণে বলা হয়েছে যে নৃত্যকালে বিভিন্ন হস্ত ও 'অভিনয়ের' মাধ্যমে রতি ও লীলার প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত নান্দনিক পটুতায় ।

মহাস্থানগড়ে গুহাগাত্রে খোচিত সুতনুকা দেবদাসীর কথাও পাওয়া যায় ।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যেও সে সময়ের বাংলায় প্রচলিত নৃত্যধারার বর্ণনা পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকীর্তি। মনসামঙ্গল কাব্যে আছে যে নায়িকা বেহুলা দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য নৃত্য প্রদর্শন করে তার জীবনের অভিষ্ট পূরণ করেছিলো। মনসামঙ্গল কাব্যেরই প্রথম দিকে পরপর কয়েকটি শিব নৃত্যের বর্ণনা আছে। মনসার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ শিব নৃত্য পরিবেশন করছেন বলে উল্লেখ করা আছে। নৃত্য তালভঙ্গ সে যুগের সমাজে এক কঠিন অন্যায় বা পাপ বলে পরিগণিত হতো। মনসামঙ্গলে উষা - অনিরুদ্ধের উপাখ্যানে জানা যায় যে নৃত্যে তালভঙ্গের অপরাধে তাদের স্বর্গ থেকে বারো বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল। মনসামঙ্গলে পাওয়া যায় বেহুলা নৃত্যপটিয়সী ছিলেন। খ্রীষ্টিয় সতের শতকের কবি রামদেবের অভয়ামঙ্গল কাব্যে স্বর্গনর্তক মালাধরের ইন্দ্রের সভায় নৃত্য প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। আঠারো শতকের প্রথম-ভাগে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যবর্ণনা পাওয়া যায়। রচনার সৌকর্য এমন পর্যায়ের যে মনে হয় রচয়িতা এমনই এক নৃত্য নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। বলা বাহুল্য এ সময়ের সামন্ত রাজসভায় অনুরূপ নৃত্য পরিবেশন অপ্রচলিত ছিল না।

বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় সাহিত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের উল্লেখ ছাড়াও ভারতের ললিত নৃত্য প্রসঙ্গে সর্বপ্রাচীন প্রমানাদি পাওয়া যায় ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও শিলালিপিতে। সিন্ধু সভ্যতাকালীন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধাতু ও প্রস্তর মূর্তির অঙ্গভঙ্গিমা থেকে তৎকালীন নৃত্যকলার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সিন্ধু সভ্যতার সময়সীমা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর থেকে ১৫০০ বছর পর্যন্ত। মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া নর্তকীর একটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তিতে সে সময়ের নৃত্যধারা প্রসঙ্গে, তার অলংকারাদি প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হরপ্পায় নর্তকের প্রস্তর মূর্তির যে টরসো পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মাথা না থাকলেও ভাঙা বাঁ পায়ের

হাঁটুর ওপরের অংশের ভঙ্গিমা বিশ্লেষন করলে বোঝা যায় তা সাধারণ দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা নয়। বাঁ পাটি বাটি থেকে তোলা অবস্থায় ছিল। কল্পনা-শক্তির ব্যবহারে বোঝা যায় এই মূর্তির শারীরিক ভঙ্গিমার সাথে পরবর্তী কালের নটরাজ মূর্তির প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টপূর্ব ২০০ বছরের সময়কাল থেকে ভারতে তিনটি প্রধান ধর্মতত্ত্বের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রভাবের উত্থান ও বিকাশ আরম্ভ হয়। মৌর্যবংশীয় (খৃঃ পূঃ ৩২২ - ১৮৫) সম্রাট অশোকের সময় যে সমস্ত বৌদ্ধ ভাস্কর্য পাওয়া যায় তার মধ্যে সাঁচীস্তূপ বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ৩০০ বছর থেকে ২০০ বছরের মধ্যে অশোক এই স্তূপ নির্মান করান। এই স্তূপের বিভিন্ন ভাস্কর্যে সে সময়ের ভারতীয় বিশেষতঃ মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার যথাযথ স্ফুরণ ঘটেছে। পূর্বদিকের তোরণের ওপরের দিকের ব্রাকেটে যক্ষীমূর্তিটি এরকম শিল্পকলার এক বিশেষ নিদর্শন। মূর্তির ভঙ্গিমার সাথে শাস্ত্রীয় নৃত্যের নান্দনিক ভঙ্গিমার প্রচুর মিল পাওয়া যায়। ওই স্তূপের দক্ষিণে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের গঠনশৈলীতে ও বিদিশার নিকটস্থ হেলিওদোরাস স্তম্ভের স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে গ্রীস দেশের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতিক বিনিময়ের সূত্র মেলে।

কলিঙ্গযুদ্ধের সময় উড়িষ্যার থেকে জৈনদের পবিত্র বেদী জিনা মূর্তিসহ বিজয়ের স্মৃতি হিসাবে অশোক নিয়ে যান। পরবর্তী কালে রাজা খারবেল ওই বেদিটি উদ্ধার করেন এবং এই জয়ের গৌরবময় স্মৃতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে খৃঃ পূঃ দুই শতকের উদয়গিরি পাহাড়ে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করান যাতে সে সময়ের উড়িষ্যার শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ওই লিপিতে 'দম' বলে একটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে যা সম্ভবত অর্থশাস্ত্রের দর্প কথাটি থেকে উদ্ভূত এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কিত। এরই পাশাপাশি উদয়গিরির জৈন গুহামন্দির-গুলিতে

নৃত্যগীত সম্পর্কিত অজস্র ফলক পাওয়া যায়। হাতীগুম্ফার একটি ফলকে দেখা যায় এক নারী নৃত্যের ভঙ্গিমায় পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছে। রাণীগুম্ফার দক্ষিণ দিকের একটি ফলকে খোদাই করা ছবিতে দেখা যায় চৈত্যবৃক্ষের নীচে একদল ধার্মিক নারী পুরুষ নৃত্যগীত সহকারে বন্দনারত। খদিত বাদ্য যন্ত্রগুলির মধ্যে বীণা মৃদঙ্গ বাঁশী এবং করতাল দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহার এবং স্তূপ পাওয়া যায় সেগুলিতেও যথেষ্ট পরিমানে নৃত্য সম্পর্কিত তথ্যমেলে। 'কারলীর' গুহাবিহারের (খৃঃ দুই শতকের) চৈত্যের দেওয়ালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি নারী পুরুষের যুগলমূর্ত্তি দেখা যায় যারা নৃত্যের ভঙ্গিমায় অর্ঘ নিবেদন করছে। আবার একটি মার্বেল ফলকে ধ্বংসাবশেষে চিত্রিত হয়েছে বুদ্ধের পদবন্দনা।

ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তবংশীয় যুগ (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক ৫ম শতকের শেষ পর্যন্ত) কে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে এই সময়ের শিল্পসংস্কৃতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।' দেওগড়','বাদামী','আহোল','অজন্তা' এই সমস্ত জায়গায় গুপ্তবংশীয় শিল্পের প্রচুর নিদর্শন মেলে যেগুলিতে তৎকালীন নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রায় ১৫০ বছরের উত্থান ইতিহাসের পর গুপ্তবংশীয় সংস্কৃতি অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়।

পরবর্তী পাঁচশতাব্দী জুড়ে পল্লব, চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট বংশের বিকাশ ঘটে। এই সময়ের শিল্প সংস্কৃতিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বাদামী, আহোল, অজন্তা , কাঞ্চীপুরম, মহাবলীপুরন এবং ইলোরা জুড়ে আহোলের দুর্গা মন্দির (খৃষ্টীয় ছয় শতক) নৃত্যরত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মূর্ত্তির বেশ কয়েকটি ফলক পাওয়া যায়। হাবপল্লা মন্দিরের একটি ফলকে (খৃঃ ছয় শতক) চারনারী মূর্ত্তির মধ্যে

দুজন নর্তকীর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে । বাদামীর গুহাগুলিতেও নৃত্য সম্পর্কিত প্রচুর ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া যায় । ১ নং গুহায় (খৃঃ ছয় শতক) নৃত্যরত শিবের মূর্ত্তি আছে । ৩ নং গুহায় (খৃঃ ৫৭৮) ত্রিবিক্রমভঙ্গির বিষ্ণু মূর্ত্তি খোদিত আছে ।

অজন্তার বিভিন্ন গুহা চিত্রগুলিতেও নৃত্য সম্পর্কিত প্রচুর চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে । একইভাবে ইলোরার বিভিন্ন গুহাতেও নৃত্য সম্পর্কিত প্রচুর তথ্যের সন্ধান মেলে । (১৬ নং লঙ্কেশ্বর গুহার প্রধান ফলকে নৃত্যরত শিবের মূর্ত্তি খোদিত আছে (খৃষ্টীয় ৭৫০ - ৮৫০) ২১ নং (রামেশ্বর গুহার বারান্দার সম্মুখ ভাগে দেবী গঙ্গার নৃত্যরতামূর্ত্তি খোদিত আছে ওই গুহারই দক্ষিণ দিকের উপাসনা গৃহে অষ্টভুজ শিবের নৃত্যরত মূর্ত্তি খোদিত আছে । উপাসনা গৃহের বাঁদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রীদের মূর্ত্তিও আছে (খৃষ্টীয় ৬৪০ - ৬৭৫) পূর্বদিকের দেওয়ালে তৎকালীন দর্শকদের মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায় । এলিফ্যান্টগুহায় (খৃষ্টীয় ৮ শতক) শিবের মন্দিরের একটি প্যানেলে নটরাজের মূর্ত্তি খোদিত আছে ।

পল্লবযুগীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই ছড়িয়ে আছে । মহাবলীপুরমের মন্দিরে (খৃষ্টীয় ৭ শতকের প্রথম ভাগ) গঙ্গাবতারনের একটি দৃশ্য ফলকে খোদিত করা হয়েছে ।

চালুক্যবংশের সময়কালে (খৃষ্টীয় ৭৪০ সালে) দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাণী শিবের লোকেশ্বর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে বিরূপাক্ষ মন্দির নির্মান করান । এই মন্দিরেও শিবের নৃত্যরতমূর্ত্তি খোদিত আছে, মধ্যযুগের শেষদিকে (খৃঃ ১০০০ - ১৩০০) উঃ ভারতের খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে নৃত্য কলার নিদর্শন অসংখ্য । পশ্চিমমন্ডলীর কান্ডরীয় মহাদেও, লক্ষণ, জগদম্বা প্রকৃতি মন্দিরে অসংখ্য নৃত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন চোখে পড়ে । জগদম্বা মন্দিরের একটি ফলকে রূপমুগ্ধ মোহিনীর

দর্পন ভাস্কর্য খোদিত আছে । লক্ষণ মন্দিরের ফলকে ক্রীড়রতা রমনী মূর্ত্তি দেখা যায় । পূর্বখন্ডলীর পার্শ্বনাথ মন্দিরে নর্তকীদের পদরঞ্জন, নূপুর পরা প্রভৃতি মূর্ত্তি দেখা যায় । একই সময়ে রাজপুতানায় পাওয়া একটি নৃত্যরত গণেশমূর্ত্তি সে সময়কার নৃত্যের পরিচয় বহন করে । আবার উত্তর কিংবা মধ্য ভারতে কোনখানে পাওয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি কৃষ্ণদেবতার মূর্ত্তিতেও নাচের বর্ণনা আছে । দাক্ষিনাত্যে মধ্যযুগের প্রথম দিকে রাজত্ব বিস্তার করেছিল চোল ও পান্ডিয় বংশ সে সময়ও বিভিন্ন মন্দির ভাস্কর্যে নৃত্যকলার বিভিন্ন ভঙ্গিমা দেখতে পাওয়া যায় । চিদম্বরমের মন্দিরগাত্রে ১০৮টি করণ খোদিত আছে।

ওই একই সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশে পাল, সেন, সোলাঙ্কি এবং গঙ্গাবংশ রাজা শাসন করতেন তারাও শিল্পকলার বিকাশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । সে সময় বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভে, মন্দিরে, গুহায়, চিত্রকলায় নৃত্য সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায় । সেন ও পাল বংশের সময়কালীন বাংলায় নৃত্যগীত বাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্পর্কে প্রমাণ সুপ্রচুর । ওই সময়ের দেবদাসীদের প্রত্যেককেই নৃত্য গীতে পটুত্ব অর্জন করতে হতো । তারা যে নানাকলা নিপুনা ছিল একথার ইঙ্গিত সেন লিপিতে আছে । পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে আরও অসংখ্য মাতর ও প্রস্তর মূর্ত্তিতে নানা ভঙ্গির নৃত্যরত পুরুষ ও রমনীর প্রতিকৃতি প্রচুর । পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, প্রস্তরচিত্রে নানাধরণের বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে যেমন, কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ ইত্যাদি । প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজাদের রাজত্বকালে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের কারণে ও প্রভাবে । এই সমস্ত মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে মন্দিরের দেওয়াল, স্তম্ভ, দরজা প্রভৃতিকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে ভাস্কর্যের মাধ্যমে। এবং তা অধিকাংশই নৃত্যরত ভঙ্গিমা । এবং এই সমস্ত নৃত্যভাস্কর্যের সাথে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রচুর মিল আছে ।

রেফারেন্স : বাংলার লোকনৃত্য - ভল্যুম [redacted] [redacted] আশুতোষ ভট্টাচার্য
নীহাররঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস ।
সনৎ মিত্র - আর্টিকেল ।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে এই সমস্ত নৃত্য ভাস্কর্যগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবেই যুক্ত ছিল। উড়িষ্যা একটি মন্দির কেন্দ্রীক প্রদেশ। ভুবনেশ্বরের অদূরে অবস্থিত পাহাড় কেটে নির্মিত গুহামন্দির খণ্ডগিরি, উদয়গিরির, – হাতিগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী, প্রভৃতি - ভুবনেশ্বরের রাজারাণী, লিঙ্গরাজ, মুক্তেশ্বর, ভরতেশ্বর, লক্ষণেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর ইত্যাদি পাঁচ শতাধিক মন্দিরের, কোনারকের সূর্যমন্দিরের, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অলঙ্করণ - ভাস্কর্য হিসাবে দেওয়ালের গায়ে সুরসুন্দরীদের মূর্তি এবং যে সমস্ত ব্রাকেট মূর্তি পাওয়া যায় সেগুলির ভঙ্গিমার সাথে নাটশাস্ত্রে ভরতমুনী কথিত স্থান এবং চারীর সাদৃশ্য আছে। বিভিন্নযুগে উড়িষ্যায় বিভিন্ন বংশীয় রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। তাদের ধর্মও ভিন্ন হওয়ায় এই মন্দিরগুলিতে ও ভাস্কর্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট।

জৈনধর্মের যুগ এবং রাজা খারবেল :

জৈনধর্ম উড়িষ্যার প্রাচীন কালেই এসেছিল। এই ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে খারবেল ছিলেন শৌর্যে ও বীর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়শতাব্দীতে। তিনি ঐ সময় উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির - মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী, হাতিগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, ইত্যাদি গুহামন্দিরগুলি নির্মান করেন তাতে জৈন প্রভাব সুস্পষ্ট। উদয়গিরিতে নৃত্যরতা পুরুষ, রমনীমূর্তি এবং বাদ্যযন্ত্রীদের মূর্তি সম্বলিত প্যানেল পাওয়া যায়। হাতিগুম্ফায় একজন নারীকে নৃত্যরতা অবস্থায় ফুল নিবেদন করতে দেখা যায়। রাণীগুম্ফার ডানদিকে একটি ভাস্কর্যে একদল নরনারীকে একটি চৈত্যবৃক্ষের চারপাশে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্যশীল অবস্থায় দেখা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের যুগ এবং ভৌম-কর বংশ :

খারবেলের রাজত্বের পর থেকে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত, যতদিন না তৎকালীন উড়িষ্যায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে নৃত্যভাস্কর্যের প্রমান পাওয়া যায় না। এই সময়ের ভাস্কর্যে নৃত্যরত বৌদ্ধদেবদেবীর - মারিচী, বজ্রবরাহী, অচনা, অপরাজিতা, হেরুকা প্রভৃতির মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ললিতগিরির দরজার ফ্রেমের পাশে পাথরের ফলকে নৃত্যরত পুরুষ ও নারী দেখা যায়। এই একই ধরনের মূর্ত্তি পাওয়া যায় উদয়গিরির দ্বারপথ ও কদোর মণ্ডলের রাজধানী বাঙকাবার ধ্বংসস্তূপে। রত্নগিরিতে দেবী হেরুকার একটি মূর্ত্তি পাওয়া যায় যাতে তিনি গলায় নরমুণ্ডের মালা ও হাতে খাটাঙ্গ নিয়ে নৃত্যময়ী। চৌধারে বজ্রবরাহীর নৃত্য ভাস্কর্য আছে। রত্নগিরি, অযোধ্যা, খিচিং। উদলা এবং অন্ট বসাঁ মারীচির নৃত্যভাস্কর্য পাওয়া যায়। ললিতগিরিতে দেবী অপরাজিতার নৃত্যশীলা মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরশেষে কিংবা সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে উড়িষ্যায় বজ্রযান বৌদ্ধদের তান্ত্রিক প্রভাব পড়ে। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত নির্মিত হিরাপুর ও রাণীপুর ঝরিয়াল মন্দিরে নৃত্যশীলা যোগীনী মূর্ত্তি পাওয়া যায়। হিরাপুরে চৌষট্টি যোগিনী মূর্ত্তি বিখ্যাত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভৌম বা কর রাজাদের রাজত্বকাল। এই সময়ে ভৌম বংশীয় রাজারা প্রচুর শিব মন্দির নির্মান করেন। এগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বরেই দশটি। বৈতাল মন্দির, মার্কণ্ডেশ্বর মন্দির এবং শিশিরেশ্বরের মন্দিরে নটরাজ মূর্ত্তি এবং অন্যান্য নৃত্যভাস্কর্য প্রচুর।

গঞ্জাম জেলায় গঞ্জাম শিবের মন্দির, বজ্রকোটের ভিমেশ্বর মন্দির, ঢেনকানলজেলায় কোয়ালোর মন্দির, বৈদ্যনাথের কোশলেশ্বর মন্দির, নীলমাধব বিষ্ণু

এবং সিদ্ধেশ্বর শিবের জোড়ামন্দিরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নটরাজ মূর্তি আছে ।

কেশরী বংশ

ভৌম বংশের পর কেশরী বংশের শুরু, এই সময় স্থাপিত মন্দির গুলি ভরতেশ্বর। লক্ষণেশ্বর পরশুরামের মন্দিরে চৌদ্দ ও ত্রিভঙ্গ করনের ভঙ্গিমার মূর্তি এবং দশ হাত, আটহাত এবং ছয় হাত বিশিষ্ট নটরাজ পাওয়া যায় । হস্ত মুদ্রার মধ্যে অরাল। অর্ধপতং, মুষ্টি, অলপদ্ম প্রভৃতির দেখতে পাওয়া যায় ।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেশরী রাজারা রাজত্ব করেন । যযাতি কেশরী লিঙ্গরাজ নির্মান শুরু করলে তাঁর স্ত্রী কলাবতীদেবী তা সমাপ্ত করেন এবং এই মন্দিরে নাটমণ্ডপ ছিল । ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে শিলালিপিতে মাহারী বা দেবদাসী প্রথার কথা পাওয়া যায় । ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দিরে চারটি নটরাজ মূর্তি আছে চারদিকে । তাণ্ডব ভঙ্গিমায় নারীমূর্তিও আছে । জগমোহনে আবিবস্ত্র নর্ত্তকীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় জগমোহনের হাতে নৃত্যরত গনেশ মূর্তি আছে ।

গঙ্গা বংশ

কেশরী বংশের পর উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন গঙ্গাবংশের রাজারা । ১০৭৮ - ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত এরা রাজত্ব করেন । এদের সময়ে ' রাজারানী' মন্দির স্থাপিত হয় । এখানে অপূর্ব নটরাজ মূর্তি আছে । পার্বতীর নৃত্য ভঙ্গিমা খোদিত আছে । এবং নৃত্যশিলা নায়িকা মূর্তি আছে । এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব ।

১০৭৬ - ১১৪৭ পর্যন্ত ছিল তার রাজত্ব কাল। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। মুখলিঙ্গমের মধুকেশ্বর মন্দির এবং পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মান করান। দেববিগ্রহের সামনে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য তিনি দেবদাসী নিয়োগ করেছিলেন। মধুকেশ্বর ও পুরীর মন্দিরে। জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্যরত নটরাজ ও গনেশমূর্ত্তি আছে। ভোগমণ্ডপের বাঁদিকে একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার সামনে নারীদের নৃত্য প্রদর্শনের দৃশ্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি আছে কালীয় নাগের ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্যরত।

রাজা প্রথম নরসিংহদেব (১২৩৮-১২৬৪) কোনরক সূর্যমন্দির নির্মান করেন। এখানে জগমোহনের ওপরে ছটি নৃত্যরত ভৈরব মূর্ত্তি আছে এছাড়াও নারী বাদ্যযন্ত্রীদের মূর্ত্তি ও নৃত্যরতা সুরসুন্দরী মূর্ত্তি আছে।

গজপতি বংশ

গঙ্গাবংশের পতনের পর সূর্যবংশীয় গজপতি রাজারা উড়িষ্যায় সিংহাসনে বসেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। রাজা কপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে মন্দিরে নৃত্যের সাথে গীতগোবিন্দ গাওয়া হতো। জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেবের রাণী পদ্মাবতী জগন্নাথমন্দিরের নৃত্য প্রদর্শন করে 'গোপসুন্দরী' লাভ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সময় থেকে নৃত্য ও ভাস্কর্যের চরম অবনতি ঘটে কারণ তিনি মুঘলদের দ্বারা পরাজিত হন। তবে প্রাচীন উড়িষ্যায় ভাস্কর্য ও নৃত্য এই দুইই ছিল একে অপরের পরিপূরক।

অতএব একথা জানা ও বোঝা যায় যে প্রাক-মধ্যযুগীয়, মধ্যযুগীয় সময়ে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে, শিলালিপিতে, ধাতব ফলকে, নৃত্যকলা ছাড়াও মন্দিরের নিয়মাবলীও কর্পোরেট সম্পর্কিত প্রচুর তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে ভারতের সংস্কৃতি মূলত নৃত্যকলা পুরোপুরি মন্দির কেন্দ্রীক হয়ে উঠেছিল। মন্দিরকেন্দ্রীক নৃত্যকলার অর্থ, মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য পটিয়সী রমনীদের উৎসর্গ করা হতো দেবতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, এই নারীরা দেবদাসী নামে পরিচিত ছিল। দেবদাসী প্রথা প্রায় সমস্ত ভারত জুড়েই প্রচলিত ছিল, যদিও মূলত এই প্রথার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল দাক্ষিনাত্যে অর্থাৎ তামিল, তেলেগু, কান্নড় অঞ্চলে। তাছাড়া উড়িষ্যা, আসাম ও কাশ্মীরেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎপত্তির কেন্দ্র হচ্ছে ধর্ম এবং ধর্মীয়স্থান অর্থাৎ মন্দির। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন মন্দিরের নিজস্ব নর্তকী থাকত এবং তারা মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করত। এরা হচ্ছেন দেবদাসী। এই মন্দির কেন্দ্রীক নৃত্যের উৎস বৈদিক যুগের মহাব্রত অনুষ্ঠান থেকে। বলা হয় দাসী আট্টমের মহাব্রত থেকেই সূত্রপাত। বৈদিক যুগে নারীরা দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য নিবেদন করত কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব নারীরা নিজেরাই দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতহতো। এরা নৃত্যের মাধ্যমে দেবতার সেবা করত। এই কারণেই এই সমস্ত উৎসর্গীকৃত নারীদের বলা হতো দাসী। দক্ষিণ ভারতে আট্টম শব্দ অর্থ নৃত্য এবং এই নারীদের উৎসর্গীকৃত নৃত্যকে বলা হতো দাসীআট্টম। অতএব দাসী আট্টম এক বিশেষ শ্রেণীর নারীদের অনুশীলিত নৃত্যকলা। এই সম্প্রদায়ের নারীরা আগে সারা ভারতেই ছড়িয়ে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে বহু কারণে এরা উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হয়। দক্ষিণভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ কম হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বহুদিন পর্যন্ত টিঁকে থাকে এবং পরবর্তী কালে দেবদাসী হিসাবে পরিচিত হয়।

সমাজপতিদের চক্রান্ত এবং নষ্টজনদের ভণ্ডামীতে এদের পবিত্র জীবন ক্রমশ: ব্যাভিচার ও কলুষতায় পর্যবেসিত হতে থাকে। পিতামাতার দারিদ্র ও ধর্মান্ধতার

সুযোগ নিয়ে পুরোহিত ও নত্তুভানদের চক্রান্তে মাতাপিতার কাছ থেকে মন্দির, মন্দির থেকে গনিকালয় ও রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে ।

দক্ষিণভারতে পল্লব ও চোল বংশের রাজাদের রাজত্বকালে প্রচুর বিখ্যাত মন্দির গড়ে ওঠে । এই সময়ই বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদনার জন্য এক বিশেষ নৃত্যধারা গড়ে ওঠে যা ধর্ম ও শিল্প সমন্বয়ে গঠিত । এই নৃত্যধারার নাম ভরতনাট্যম । এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল সাদির, কুরুভঞ্জী এবং ভাগবতমেলা নাটকম । এর মধ্যে সাদির ও কুরুভঞ্জী মন্দিরকেন্দ্রীক নৃত্য মন্দিরের বিভিন্ন কাজে ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই এর উপস্থাপনা সীমাবদ্ধ এবং এই নাচে অংশ গ্রহন করত দেবদাসীরা । ভাগবতমেলায় সাধারণ গ্রামবাসীরা অংশ নিত সাদির একক ও কুরুভঞ্জি যৌথ নৃত্য । সাদির নৃত্যের অংশগ্রহণকারীরা দেবদাসী বলে এর আর এক নাম দাসীআট্টম ।

এই দেবদাসী প্রথার জন্য দক্ষিণভারতের তৎকালীন মন্দিরগুলি ভরতনাট্যম ধারার নৃত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই নৃত্যানুষ্ঠান মন্দিরকেন্দ্রীক ছিল । কিন্তু পরবর্তী কালে ভরতনাট্যমের প্রদর্শনা রাজদরবার এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজদাসী ও অলংকারদাসীর জন্ম হয় । পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে দেবদাসীদের মধ্যে নৈতিক স্খলন শুরু হয় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে । সবশেষে ১৯৪৭ সালে সরকারী আইনের সাহায্যে দেবদাসীপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর ফলস্বরূপ সমগ্র দক্ষিণভারতে এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটে ।

উড়িষ্যায় এই দেবদাসীদের বলা হতো মাহারী । দুই শ্রেণীর ছিল ভিতরগনি ও বাহারগনি মাহারী । মাহারিরা ওড়িশীনৃত্যে অন্তত দুই শত বছর একাধিপত্য রক্ষা করে গেছে ।

পরবর্তী কালে এদের রক্ষণাবেক্ষনে অবহেলা দেখা দেওয়ায় এদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ক্রমশ প্রায় অবলুপ্ত হয় । উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল না ।

পূর্বভারতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এদের বলা হতো মৈবী। তবে মণিপুরে দেবদাসীদের মত পুরুষদেবদাসী দেখতে পাওয়া যেত এদের বলা হয় মৈব।

তবে একথা বলা যায় যে ভারত বর্ষের প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাগুলির এক প্রধান অংশের উদ্ভব ঘটেছে ধর্ম এবং ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মীয় কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে এবং এই নৃত্যধারাগুলির প্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন স্থানের মন্দিরগুলি বা তৎকালীন রাজারা নিজস্ব রক্ষনাবেক্ষনে নর্তক ও নর্তকীদের পোষন করেছেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ভারতবর্ষের নৃত্যধারায় পিছনে ধর্ম ও মন্দিরগুলির দান সীমাহীন। এবং দেবদাসীরা যে ধরনের জীবন ধারন করুন না কেন মূলতঃ তারা নৃত্যশিল্পী এরা ধ্রুপদী নৃত্যরূপটি চর্চা করে এসেছেন সগৌপনে। ভারতের নানাস্থলে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থানে পতনে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলি যখন ব্যাহত হয়েছে তখনও তারা এই কলাকে নিভৃতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। খ্রীষ্টীয় ১৩ শতকের শুরু থেকে উত্তর ভারতে দাস বংশের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় আর সাথে সাথে ভারতে মুসলমান রাজত্বের বিস্তার শুরু হয়। পরে ক্রমাগত রাজত্বে আসে মোগল সম্রাটগণ। এ সময়ে বিভিন্ন সভাকবি ও সাহিত্যিকরা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনায় জানা যায় যে সে সময়ে বাদ্যযন্ত্রীও ও নৃত্যপটু নারীর সংখ্যা বড় আকার ধারণ করেছিলো। রাজপরিবারের সৌজন্যে ও সাহায্যে এই বাদ্যযন্ত্রী ও নর্তকীরা তাদের শিল্পকলার চর্চা করতো। অর্থাৎ নৃত্যকলা ক্রমশই দরবার কেন্দ্রীক শিল্পকলায় পরিণত হতে আরম্ভ করে। মোগল সাম্রাজ্য ১৯ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও মূলতঃ ছয় পরাক্রমশালী সম্রাট অর্থাৎ বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলেই রাজ দরবারের সৌজন্যে শিল্পকলার বিকাশ সাধন হয়। মূলতঃ আকবর জাহাঙ্গীর আর শাজাহানের সময়কালেই শিল্পকলার উন্মেষে ও বিকাশের জন্য রাজদরবার উদ্যোগ নেয়।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজা ও সুলতানদের রাজত্বকালে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক, বণিক, বুদ্ধিজীবী এদেশে এসেছেন ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থে

তাদের ভারত পরিভ্রমনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাদের লিখিত গ্রন্থ বা বর্ণনার থেকেও ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া যায় ।

দ্বিতীয় দেবরায়ার রাজত্বকালে বিজয় নগরে আবদুলরেজ্জাক পারস্যের রাজদূত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । ১৪৪৩ সালে মহানবমী উৎসবের যা সাধারণতঃ আমাদের কাছে দশেরা নামে পরিচিত তার বিবরণ লিখেছেন । গণিকারা মূলতঃ সবাই অল্পবয়স্কা নারী রাজার সামনে স্বচ্ছ পর্দার ভিতরে তারা বসে থাকত হঠাৎ কোন এক মুহূর্তে পর্দাটিকে দুপাশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এই সব রমনীরা লাস্যময়ী ভঙ্গিতে যে নৃত্যের প্রদর্শন করতো তাতে মনের মধ্যে বিভিন্ন আবেগ ও বাসনার উদ্রেক হতো ।

অন্য এক পর্তুগীজ লেখক 'দোমিংগে পেজ্' ১৫২০ সালে এই মহানবমী উৎসব সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে উৎসবের পানভোজন আরম্ভ হতো ১১ই সেপ্টেম্বর এবং তারপর নবদিন ব্যাপী উৎসব চলত, সমস্ত উৎসবটি রাজপ্রাসাদের ভিতরে অনুষ্ঠিত হতো । প্রাসাদের ভিতরে অসংখ্য রমনী নৃত্যপ্রদর্শন করতো রাজা এবং অন্যান্য পুরুষরা প্রাসাদের অন্দর থেকে বাইরে আসবার সময়েই নৃত্যাদির অনুষ্ঠান বেশী হতো । রাজনর্তকীর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হতো মন্দিরের ভিতরে, বিগ্রহের সামনে এবং তার স্থায়ীত্ব ছিল দীর্ঘক্ষনের । বিজয়নগরের রাজা ' কৃষ্ণদেবরায়ার' রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে পেজ্ এক জায়গায় বলেছেন রাজা বিভিন্ন রমনীদের নৃত্যশিক্ষার জন্য একটি ঘরে পাঠাতেন । ঘরটি লম্বায় দীর্ঘ এবং প্রস্থে প্রশস্ত হতো এবং বিভিন্ন স্তম্ভ এবং ও দেওয়ালে পাথরের ভাস্কর্য খচিত ছিল । এইগুলি ছিল নৃত্যারম্ভ ও শেষের স্থান নির্বাচনের জন্য ।

' হারনাওয়ুনিজ' এক পর্তুগীজ বণিক বিজয় নগরে আসেন১৫৩৭ সালে এবং তিনবছর সেখানে বসবাস করেন । অচ্যুতদেবরায়ার রাজত্বকালেরবর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন রাজপ্রাসাদে চার সহস্রাধিক রমনী সর্বদাই থাকতো । এদের কিছু নর্তকী হিসাবে

পরিগণিত হতো অন্যরা রাণীর সিংহাসন কাঁধে বহন করার কাজে নিযুক্ত হত অথবা রাজার সহচরী হিসাবে পরিগণিত হতো ।

'ইমান্যুয়েল-দা-ভেগা নামে এক ইহুদি ১৫১২ সালে বিজয়নগরের রথ সপ্তমী উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ৩০ জন নর্তকী যাদের প্রত্যেকেই বিগ্রহের প্রতি নিবেদিত তারা দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য কাজ করতো এদের বিবাহের কোনও অধিকার ছিল না কিন্তু বারাঙ্গনা হিসাবে মনোরঞ্জনের অধিকার ছিল । এই সমস্ত নারীরা রথ সপ্তমীর সময় মশাল হাতে শোভাযাত্রায় যেত । মার্কোপোলো ১২৯২ - ৯৩ সালে যে দক্ষিণভারত ভ্রমন করেছিলেন তাঁর রচনাতেও দেবদাসীর উল্লেখ আছে ।

ভারতীয় নৃত্যের অবক্ষয় ও নবজাগরণ :

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় থেকেই ভারতীয় নৃত্যের মন্দির কেন্দ্রীক শাস্ত্রীয় নৃত্য কিংবা অন্যান্য স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যধারার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হতে আরম্ভ করে । গোঁড়া মুসলমান মানসিকতার ধারক বাহক সম্রাট নৃত্যগীত নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন । তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে নর্তকীদের প্রতি ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে তিনি বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখিয়েছেন । এই সময় থেকেই বিভিন্ন সামন্তরাজা জমিদার ইত্যাদিরা নর্তকীদের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের উপকরণ ভাবতে আরম্ভ করায় নৃত্যের মান চটুল মনোরঞ্জনের উপকরণে পর্যবসিত হয় । পরবর্তীকালে মহম্মদশাহ ঔরঙ্গজেবের উত্তরসূরী হিসাবে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তার সময়ে নর্তকীদের মাধ্যমে লালসা চরিতার্থের প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে যায় । মহম্মদশাহ চটুল নৃত্যপটিয়সী রমনীদের সঙ্গ এত পছন্দ করতেন যে তিনি সাধারণের কাছে 'রঙ্গীনপিয়া' হিসাবে খ্যাত হন । জানা যায় তার রাজধানীতে প্রখ্যাত নর্তকী 'অমরবেগম' সম্পূর্ণ

নগ্ন অবস্থায় নৃত্য পরিবেশন করতেন যদিও তার সমস্ত শরীর বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা থাকত ।

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং ভারতবর্ষের জন্য দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ মারাঠা ও শিখ জাতির উত্থান হয় । মারাঠারা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে খ্যাতনামা হলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাদের ভূমিকা প্রচুর নয় । উদাহরণ স্বরূপ 'ছত্রপতি শাহু' নিজের মহলে সুন্দরী নর্তকীদের রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠান । পেশোয়ার দ্বিতীয় শাসক প্রথম বাজীরাওর সুন্দরী রমনী আসক্তি এতো তীব্র ছিল যে 'মস্তানী' নামে এক মুসলীম নর্তকীকে তিনি যুদ্ধের সময়েও সঙ্গে নিয়ে যেতেন । শিখ সম্রাটদের মধ্যে মহারাজা রঞ্জিতসিংজীর দরবারে এক খ্যাতনামা নর্তকীর উল্লেখ পাওয়া যায় । জানা যায় কোন এক সন্ধ্যায় নর্তকীদের নাচঘরে প্রবেশ ঘটে গান ও বাজীর আওয়াজের মধ্যে । রঞ্জিতসিংজীর প্রাসাদে ৯৫০ জন সুন্দরী নর্তকী ছিল ।

১৫ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন আরম্ভ হয় । ক্রমানুয়ে ভারতে আসতে থাকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা । তারা প্রমোদ ভ্রমনের কারণে ভারতে আসেনি এসেছিল বণিক হিসাবে । কাজেই ব্যবসার প্রয়োজনে তারা ভারতে বসবাস করেছে এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগের পথ ব্যবহারে কুণ্ঠা করেনি । তাই এরকম নিরাপত্তাবিহীন ভ্রমনের ক্ষেত্রে তারা স্ত্রী-পুত্র স্বজনদের স্বদেশে রেখে আসতো । স্বজনদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা আর অবসরযাপনের অভ্যস্ত পন্থার অনুপস্থিতিতে তারা স্থূল প্রমোদের রাস্তাকে বেছে নেয় । এর থেকেই জন্ম নেয় বাইজী আর নাচনেওয়ালী সম্প্রদায়ের । এসময়ে নৃত্যের অবক্ষয় আরো দ্রুত হয়ে উঠতে আরম্ভ করে । মন্দিরকেন্দ্রীক দেবদাসীরা বিগ্রহের আরাধনা ছেড়ে বহিঃসমাজে এসে এইসব পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়

নানা আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার জন্যে । এই পরিস্থিতি ও পরিবেশের কারণে রুচিবান মানুষেরা বিভিন্ন নৃত্যালয়ের পথ এড়িয়ে চলা আরম্ভ করে, আর ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছে নৃত্য পরিগণিত হয় মনোরঞ্জন আর লালসা - উদ্রেক করার এক স্থূল মাধ্যম হিসাবে ।

এ সময় আর তার পরবর্তী কাল ভারতের নৃত্য ইতিহাসে খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় । নৃত্য সম্পর্কে তার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা সম্পদ সম্পর্কে আধুনিক বুদ্ধিজীবী দের কোনো ধারনাই ছিল না বলা যায় ; - এমনকি তিরিশের দশক পর্যন্তও, ইংরেজ আমলে দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি উত্তর ভারতের নবাব আর মহারাজদের দরবারে এবং বড় শহরগুলির 'বাবু' কেন্দ্রিক অভিজাত সমাজে বাইজী নৃত্যের যে ধারা চালু ছিল সে সম্পর্কে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলের ধারনা অত্যন্ত খারাপ ছিল । বলাবাহুল্য এটা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী নৃত্যধারা নয় ; তার অতি নিকৃষ্ট ও বিকৃত অপভ্রংশ মাত্র ।

একমাত্র দক্ষিণ ভারতেই ভরতনাট্যম ও কথাকলির মত ধারা ভারতের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে ছিলো । বস্তুত যে সব খ্যাতিযশা গুরু ও শিল্পী এই নৃত্যধারাকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা নিজেরাও সেভাবে সচেতন ছিলেন না, এই অমূল্য শিক্ষা সম্পদ সম্পর্কে ; যান্ত্রিকভাবে তারা অন্ধ অনুবর্তন করে চলেছিলেন মাত্র । এমনকি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যগুলি সম্পর্কেও সে সময়ের শহুরে বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল না । উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলা তথা ভারতে যে নব জাগরনের সূচনা হয় তখনও এই নবজাগরণের প্রভাব ভারতের নৃত্যধারার ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্ব আরোপ করেনি ।

বস্তুত ভারতের নৃত্যের নবজাগরণ বিদেশের মাটিতেই শুরু হয়েছিল বলা যায় । বিস্ময়করভাবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপে ভারতীয় বিষয়বস্তুর ওপরে নৃত্য প্রদর্শন শুরু হয় । এসময় ইউরোপে রোমান্টিক ব্যালের যুগ । ১৮৩০ সালে প্যারিসে ' লা-দ্যিউ - এৎ - লা - বেদর ' নামে যে ব্যালে অনুষ্ঠিত হয় এবং নৃত্যসমাজে

আলোড়নের সৃষ্টি করে তার বিষয়বস্তু ছিলো 'দেবতা ও নর্তকী যা মূলত দক্ষিণ-ভারতের দেবদাসীদের কাহিনীকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিখ্যাত রুশীয় কোরিওগ্রাফার 'মারিয়াস পেটিপা'' লা বেয়াদের' নামে যে বিখ্যাত ব্যালের সৃষ্টি করেন তার বিষয়বস্তুও দেবদাসী ভিত্তিক। 'লা বেয়াদের' এর অর্থ 'নর্তকী কন্যা', এই ব্যালেটি বর্তমানের সোভিয়েত ব্যালেতে একটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। অন্যান্য কোরিওগ্রাফাররাও ভারতীয় বিষয়বস্তুর ওপর নানা ব্যালে রচনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকায় কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। নিউইয়র্কে তখন চলছিল 'ভারত উৎসব'। এই উৎসবে বাজীকরী খেলা জিপসী নাচ, এবং অন্যান্য নাচ উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণকারীরা কেউই ভারতীয় ছিল না। সকলেই ছিল স্থানীয় অধিবাসিক। যারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি দেখে উপভোগ করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন প্রখ্যাতা নর্তকী 'রুথ-সেন্ট-ডেনিস' এবং এই অনুষ্ঠানগুলি দেখে তিনি এতো উদ্বুদ্ধ হন যে ভারতীয় বিষয়ে নৃত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। অপে তিনি প্রাচ্য দেশগুলির ওপরে এবং বিষয়ে আরও নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এসময় ভারতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে 'রাধা', 'দ্য ইনসেন্স', 'দ্য কোবরা', 'দ্য নাচ্', 'দ্য ইয়োগী', প্রভৃতি নৃত্যগুলির সৃষ্টি করেন, ১৯১৬ সালে প্রখ্যাত আমেরিকান নর্তক 'টেড সোয়ান'কে তিনি অন্যতম নৃত্যসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং উভয়ে ভারতীয় নৃত্য বিষয়ে বিভিন্ন নৃত্য বিভিন্নস্থানে পরিবেশন করতে থাকেন। এ সময়ের পরিবেশিত নৃত্যগুলির মধ্যে 'টেডসোয়ানে'র একক অনুষ্ঠান 'দ্য কসমিক ড্যান্স অফ - শিবা এবং উভয়ের দ্বৈত নৃত্য 'রাধা এণ্ড কৃষ্ণা' উল্লেখযোগ্য।

১৯০৯ সালে সেন্টপীটার্সবার্গে প্রখ্যাত রুশ নর্তকী আনাপাভলোভা 'শোপেনিয়ানা' মঞ্চস্থ করেন এবং পৃথিবীর নৃত্য ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাশিয়ায় ইম্পেরীয়ান থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল।

এই সময়েই পাভলোভা ভারত ভ্রমন সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন কেননা ভারতের নৃত্য প্রসঙ্গে প্রচুর আলোচনা তিনি শুনেছিলেন। ১৯২২এ তিনি ভারতে আসেন কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হয় না, কেননা এ শতকের ভারতে তখনো নৃত্য নান্দনিক অর্থে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, এর কারণ সম্পর্কে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তাই পাভলোভা শুধুমাত্র ভারতের কিছু মন্দির ভাস্কর্য, ধাতুর ভাস্কর্য আর অজন্তার মূল ছবিগুলি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন।

দু দশকের সময়েই ভারতের নৃত্যে নবজাগরণের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল সবার দৃষ্টির অন্তরালে। এই ঘটনা হল ভারতের নৃত্য আঙিনায় উদয়শংকরের তথা আধুনিক নৃত্যধারার প্রাক্ সূচনা। ১৯২০ সালে উদয়শংকর লণ্ডনে আসেন রয়েল কলেজ অব আর্টসে চিত্রকলা শেখার উদ্দেশ্যে। এই একই সময়ে আনা পাভলোভা ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমনে ব্যস্ত আর এ উপলক্ষেই লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় বিষয়বস্তু ভিত্তিক নৃত্য রচনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, সাহায্যের জন্য তিনি ভারতীয় বা ভারত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন একজনের সন্ধানে ছিলেন যে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানেও সঙ্গী হিসাবে অংশ নিতে সক্ষম হবে। এবং ঘটনাচক্রে আকস্মিকভাবেই উদয়শংকরের সাথে পাভলোভার পরিচিতি ঘটে যায়। পাভলোভা সরাসরি উদয়শংকরকে ভারতীয় বিষয় নিয়ে নৃত্য রচনায় প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সাথে নৃত্যে অংশ নিতে আহ্বান করেন। এভাবেই উদয়শংকর ভারতীয় বিষয় নিয়ে নৃত্য রচনার প্রথম ধাপে পা রাখেন নৃত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে প্রাথমিক সাফল্য পেয়ে যান। অর্থাৎ তিনি পাভলোভার জন্য দুটি নৃত্য রচনা করে দেন।

একটির নাম 'কৃষ্ণ এ্যাণ্ড রাধা' আর অন্যটি 'এ হিন্দু ওয়েডিং' । 'কৃষ্ণ এ্যাণ্ড রাধাতে' তিনি পাভলোভার সাথে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছেন এবং 'হিন্দু ওয়েডিংএ'তাদের দলের অন্য একজন সদস্য অংশ নেন । এই দুটি উপস্থাপনাই অভূতপূর্ব সাফল্য পায় । এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে পাভলোভা উদয়শংকরকে পরবর্তী আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে নিয়ে যান এবং একত্রে 'রাধা এণ্ড কৃষ্ণ' ও অন্যান্য কয়েকটি নৃত্য প্রদর্শন করেন ।

১৯১১ সাল থেকে ভারতে কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ভারতীয় নৃত্যে নবজাগরণ ও পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহী হয়ে ওঠেন । এদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, ভাল্লাথোল, গুরুসদয় দত্ত, ই কৃষ্ণ আয়ার, মাদাম মেনকা, রুক্মিনীদেবী, রামগোপাল, শান্তারাও, মৃনালিনী সারাভাই, রাগিনীদেবী প্রমুখের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ।

ভারতীয় নৃত্য - রবীন্দ্রনাথ :

নৃত্য বিশেষতঃ ভারতীয় নৃত্য এবং তার সমৃদ্ধি উন্নতি ও নবজাগরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কি ছিল সে প্রসঙ্গে মূল কয়েকটি কথা আলোচনা করা যায় । মোটামুটিভাবে নৃত্য সম্বন্ধে কবির বক্তব্য এই : - নৃত্যকলা নিছক চিত্ত বিনোদন বা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের উপকরণ মাত্র নয় । নিম্নগামী কামনা ও ভোগ লালসার কলুষ থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যকে মুক্ত করে তাকে কতখানি মনোরম ও সুন্দর শিল্পসম্মত ভাবে উপস্থিত করা যায়, কবি ১৯১৬ সালে জাপান ও ১৯২৭ সালে জাভা ভ্রমন কালে তা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি । জাভাযাত্রার পরে কবি লিখেছেন : ''এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখিনি । আমাদের নর্ত্তকী বাইজীদের আঁট পায়জামার অত্যন্ত জবড়জং কাপড়ের অসৌষ্ঠব চিরদিন আমার ভারি কুশ্রী লেগেছে । তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয় একটা মস্ত বোঝা । তারপরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানা প্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে

বোধ হয় - নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে জাপানে ও জাভাতে যে নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য ও শালীনতা ও তেমনি নিখুঁত" । ....

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্রুপদী, লোকনৃত্যের পৌরুষ বীর্য ও সৌন্দর্য ও শালীনতার একীকরণে কল্পনা ও আগ্রহ তিনি বহুদিন থেকে অনুভব করেছেন, সর্বোপরি এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও নান্দনিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে তিনি নৃত্যের নতুন ধারা সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন । বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পর থেকেই কবির মনে নৃত্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার শুরু । প্রথমে ঝুলন, পূজারিনী, শিশুতীর্থ , দুঃসময় এরকম কয়েকটি কবিতা নৃত্যে রূপদানের চেষ্টা হয় । প্রায় একই সময়ে ঋতু সংগীত ও ঋতুউৎসব ইত্যাদিতে নৃত্যের প্রয়োগ ও রূপায়নের চেষ্টা হয় । পরবর্তীকালে কিভাবে শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকার মধ্যে বিভিন্ন নৃত্যধারা প্রয়োগের চেষ্টা হয় সে সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ, প্রতিমাদেবী প্রমুখেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথাগত নৃত্যধারাগুলি সম্পর্কেও কবির আগ্রহ- আকর্ষন ছিল । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পীদের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেট যান এবং সেখানে একদল মেয়ের নাচদেখে মুগ্ধ হয়ে যান । অনুসন্ধান করে জানতে পারেন এই নাচ মনিপুরী নৃত্য হিসাবে খ্যাত ওই একই সময় কবি ত্রিপুরায় যান এবং ত্রিপুরার রাজসভায় নৃত্যগুরু বুধিমন্ত সিং এর মণিপুরী নৃত্য দেখে অভিভূত হন । তাঁকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রিদের মনিপুরী নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রন জানান । পরবর্তী ১৯২৫ সালে নবকুমার সিংকেও তিনি নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এই একই সময়ে মাদ্রাজ থেকে বাসুদেব এসেছিলেন ভরতনাট্যম শিক্ষাদানের জন্য । কেরলে সে সময় কবি ভাল্লাথোলের উদ্যোগে কথাকলি নৃত্য নতুন ভাবে বিকাশ লাভ করে । কবি শান্তিদেব ঘোষকে এই কথাকলি নৃত্য শিক্ষার জন্য কেরলে পাঠান এরপর

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খণ্ড ।। পৃ : ৫০৫

ভাল্লাথোল কেল নায়ারকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন । সিংহলের বিখ্যাত কান্ডী নৃত্য শিক্ষার জন্য কবি শান্তিদেবকে সেখানে পাঠান এমনকি জাভা ও বালিদ্বীপের ই নৃত্যশিক্ষা আয়ত্ব করে আসার জন্য শান্তিদেবকে সেখানেও পাঠান । কবি ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের দুটি ধারাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে-ছিলেন আবার পাশ্চাত্য এবং সিংহল জাভা বালিদ্বীপ, চীন ও জাপানের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যধারা থেকেও ভাল দিকগুলি গ্রহণ করেছিলেন । শান্তি নিকেতনের নৃত্যে পাশ্চাত্য ব্যালেরও প্রভাব আছে। বিলেতে ইংল্যান্ডে ডার্টিংটন হলে থাকার সময় প্রতিমাদেবী মিঃ ইয়স এর নৃত্য পরিকল্পনা দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি স্বয়ং তাঁর নৃত্য গ্রন্থে সেকথার বর্ণনা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ নাচ অত্যন্ত ভালবাসতেন নির্মল আনন্দ উপভোগের একটি বড় অবলম্বন রূপে এটিকে দেখতেন বলে অন্যরাও যাতে সেই আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায় সেই দিকে তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল তাঁর কাছে নৃত্যকলা মর্যাদা পেয়েছিল দেহের একটি চলমান শিল্পরূপে রূপে তাঁর মনকে আমোদিত করেছে এর ছন্দের আনন্দে সেই কারণেই বিনা সংকোচে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি আন্দোলন । বিভিন্ন সময়ের তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে নৃত্যকলাকে গুরুদেব একটি সম্মানজনক শিক্ষনীয় বিদ্যারূপেই দেখতেন । বাংলা দেশে এর অভাব উনবিংশ শতক থেকে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল নগরবাসী শিক্ষিত সমাজে । সেখানে নৃত্যকলা ছিল কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী । তাই পেশাদার বাইজী, খেমটাওয়ালী, যাত্রা ও থিয়েটারের পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে এর চর্চা ছিল নিবদ্ধ । বিত্তশালীর বিলাসের বাইরে মানবচিত্তে নাচের যে আর কোন স্থান থাকতে পারে সে বোধও নগরের শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণ হারিয়েছিল । সে কারণে সে যুগের নগরবাসী নরনারীদের মধ্যে কোনরূপ নৃত্যকলার চর্চা ছিল বলে জানা যায় না । কিন্তু নৃত্যকলার সম্মান অক্ষুন্ন ছিল, আজও আছে গ্রামীন সমাজে । ভারতীয় লোকনৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের পরিচয়ে তার প্রমান মেলে । নগরের শিক্ষিত সমাজের অবহেলায় গ্রামের নানা প্রকার সামাজিক নৃত্য ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল । নির্মল আনন্দ উপভোগের উপযোগী নৃত্যকলার প্রতি

শিক্ষিত সমাজের এই অবহেলা সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিক থেকে গুরুতর একটি বলেই তিনি মনে করেছিলেন এবং যার পরিণতি আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচিত পূর্ণাঙ্গ নৃত্য নাটগুলিতে। এর পিছনে গুরুদেবের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ইতিহাসটির সঠিক বিবরণে আমরা দেখি যে নৃত্যকে তিনি যে ভাবে ভালবাসতেন তা কেবল তাঁর কবি মনের ক্ষণিক হৃদয়াবেগের উচ্ছাস মাত্র নয়, এ তাঁর জীবন বিকাশের একটি আবশ্যিক সত্য, নানা উপায়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের আরম্ভকাল থেকে পরবর্তী প্রায় ২২ বছর রবীন্দ্রনাথ নিজের একক উদ্যম ও উৎসাহে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যকলাকে সম্মানজনক স্থান বিদ্যারূপে স্বীকৃতিদানে সমর্থ হয়েছিলেন। তখনকার দিনের চাকরীজীবী শিক্ষিত বাঙালী সমাজ প্রচলিত শিক্ষা-নীতির ক্ষেত্রে একে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা বলা যেতে পারে। সে যুগের ভারতবর্ষের আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৃত্যকে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এইরূপ সম্মান দেখাবার সাহস পেয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। শান্তিনিকেতনের প্রথম দু-দশকের শিক্ষক সমাজের অধিকাংশই নৃত্যকলাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সম্মানজনক স্থান দেবার মত তৈরী মন নিয়ে আসেন নি। তাঁদের সকলের মনকে নৃত্যের অনুকূলে গড়ে তুলতে গুরুদেবকে তাঁর চল্লিশবছর বয়স থেকে প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত নানা নাটকে উপলক্ষ সৃষ্টি করে, নিজে অংশ নিয়ে বারেবারে সকলকে বোঝাতে হয়েছিল যে নৃত্যকলাও একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষনীয় বিদ্যা। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে যে নৃত্যধারার উদ্ভব হয়েছিল তাকে বলা যায় ভারতীয় আধুনিক স্কুল। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যগুলি যেমন সংগীত নির্ভর, গুরুদেবের নৃত্য আন্দোলনের মূল ভিত্তিও হলো তাই।

ভাল্লাথোল :

১৯৩০ সালে দক্ষিণভারতেও নৃত্যজগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। বিখ্যাত কবি ভাল্লাথোল যিনি কেরালার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং কেরালার রবীন্দ্রনাথ বলে পরিচিত ছিলেন তিনি কথাকলি নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। এবং মনে করেন এই নৃত্যকলার জন্য অনেক কিছু করার প্রয়োজন। তিনি কথাকলি নৃত্যশিক্ষালয় স্থাপন করেন এই নৃত্য প্রচার ও উন্নত করার জন্য। এর নাম হয় 'কেরালা কলা মণ্ডলম'। প্রথম থেকেই বিখ্যাত গুরু এবং শিক্ষাবিদ্‌রা 'মোহিনীআট্টম' (যা লুপ্ত প্রায় নৃত্য ধারা হয়ে উঠেছিল) এবং কথাকলি শিক্ষাদিতেন। জন সমক্ষে এবং বিশ্বের দরবারে তিনিই প্রথম এই নৃত্যকলা উপস্থাপিত করেন এবং এই নৃত্যকলার মাধ্যমে নৃত্যকে শিক্ষিত ও জনসমাজে এনে নূতন জীবন দান করেন।

গুরুসদয়দত্ত :

গুরুসদয় দত্তই প্রথম ভারতীয় মনীষী ও বুদ্ধিজীবী যিনি সর্বপ্রথম নৃত্য তথা লোকনৃত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং এই বিষয়টি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করেন।

তিনি শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রীতে ১৮৮২তে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবস্থা থেকেই খেলাধূলায় তাঁর উৎসাহ জন্মায়। এবং এই খেলাধূলায় মধ্যেও তিনি লোকনৃত্যের প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করেন। মেধাবী ছাত্র গুরুসদয় ১৯০২ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন এবং আই.সি.এস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ড যান এবং ১৯০৪ সালে স্বদেশে এসে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। এই কর্মজীবনের মধ্যেই তিনি জাপান ও ১৯২৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত লোক নৃত্য উৎসবে

যোগদান করেন । পাশ্চাত্য জাতি জাতীয় জীবনে লোকনৃত্যের ওপর কতদূর গুরুত্ব আরোপ করে তা তিনি প্রত্যক্ষ করে আসেন এবং তাঁর কাজের মধ্যে এটি নূতন প্রেরণা সঞ্চার করে ।

ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ১৯২৯এ তিনি The Folk Dance & song society প্রতিষ্ঠা করেন ময়মনসিংহ জেলায় । এটিই ক্রমে একটি লোকনৃত্য ও লোকসংগীত প্রচার কেন্দ্রের রূপ লাভ করে । পরে বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় এর শাখা স্থাপিত হয় । ১৯৩২ সালে প্রথম লোক নৃত্য শিক্ষা শিবির স্থাপিত হয় ।

বাংলার যে সব লোকনৃত্য ঢালি, সারি, জারি, বাউল, ঝুমর প্রভৃতি নানা কারনে অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিল, তিনি লোক আঙ্গিকের এই নৃত্যগুলি পুনরুদ্ধার এবং শুধু মাত্র স্বদেশেই নয় বিশ্বের দরবারেও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । এবং শুধুমাত্র নৃত্যের পুনরুদ্ধারই নয় তিনি এগুলির একটি শিক্ষণ প্রণালী উদ্ভাবন করে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন । এবং বাংলার লোক নৃত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে এই বিষয়টির দিকে দেশের শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন । তাঁর গ্রন্থই বাংলার লোকনৃত্য বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ । অতএব গুরুসদয় দত্তই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এবং শিক্ষিত সমাজকেও সচেতন করেছিলেন ।

ই. কৃষ্ণ আইয়ার :

এই বিশ শতকের প্রথম দিকেই ভরতনাট্যমের পুণর্জাগরণ বা পুনরুত্থান আরম্ভ হয় । এই কাব্যময় কলাটি ভারতীয় নৃত্য ইতিহাসে একদীর্ঘ সময় ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছেছিল দেবদাসীদের কারণে সে প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে । কার্যত

বিশ শতকের প্রথম দিকে সামাজিক নবজাগরণের আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভরতনাট্যম সম্পর্কে প্রগতিশীল মহল সম্পূর্ণ নেতিবাচক নীতি গ্রহণ করে। তাদের মতে দেবদাসী কেন্দ্রীক এই নৃত্য নিষিদ্ধ ঘোষনা করা উচিত নচেৎ এই সামাজিক কলুষকে রুখ করা যাবে না। এই আন্দোলন নবজাগরণের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষেরও অভাব ঘটেনি। ভরতনাট্যম নিষিদ্ধকরার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এবং এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকেন প্রখ্যাত আইনবিদ্ ই. কৃষ্ণ আইয়ার। সে সময়ের দুটি বিখ্যাত কাগজ 'দ্য হিন্দু' এবং 'মাদ্রাসমেল', উভয় পক্ষেরই প্রচারের মুখপত্রের ভূমিকা নেয়।

'দ্য হিন্দুতে' প্রকাশিত ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর একটি চিঠির উত্তরে কৃষ্ণ আইয়ার লেখেন : শিল্প ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক কলুষ প্রসঙ্গে যদি আপত্তি ওঠে তবে সে কলুষকে রুখ করার জন্য অবশ্যই উদ্যোগী হওয়া উচিত। কিন্তু কলুষকে বাদ দিতে গিয়ে শিল্পকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করার যৌক্তিকতা কোথায়? বিপরীতে বলা যায় শিল্প থাকুক, বিকশিত হোক; রুখ করা হোক সে সম্পর্কিত কলুষকে। দেবদাসী সম্প্রদায় সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে ঠিক, কিন্তু ভরতনাট্যম তারজন্য দায়ী কতটুকু। তাই দেবদাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক পুণর্বাসনের ব্যবস্থাই আশু জরুরী, ভরতনাট্যমকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করাটা নয়।

এইভাবে আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলনের চাপে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১৯৪৭ সালে দেবদাসী প্রথাকে Madras Legislative Assembly নিষিদ্ধ ঘোষনা করে ভরতনাট্যমকে নয়। তাই বলা যায় ভারতীয় নৃত্য ইতিহাসে ভরতনাট্যম শৈলীর পুনর্জাগরণ প্রসঙ্গে ই - কৃষ্ণ আইয়ারের ভূমিকা অপরিসীম ও অবিস্মরনীয়।

Ref : A momentous Transition : Mohan Khokar, Sangeet Natak Issue No. 84 April - June 1987.

রুক্মিনী দেবী :

দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারত যখন বিতর্কে মেতে উঠেছে এই সময়েই ১৯৩৬ সালের ভরত নাট্যম শিল্পী হিসাবে রুক্মিনী দেবীর আবির্ভাব । দেবদাসী সম্প্রদায়ের বাইরে তিনি প্রথম মহিলা যিনি ভরতনাট্যম শৈলীকে আপাগোড়া রপ্ত করেছিলেন পুনর্পূঙ্খ ভাবে । উচ্চশিক্ষিত তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার সূত্রে শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ছোট থেকেই পরিচয় ঘটে ।

শান্তারাও :

১৯৩৯ সালে শ্রীমতী শান্তা কথাকলি নৃত্যশৈলী আয়ত্ত করার জন্য কেরালা কলামণ্ডলমের ছাত্রী হিসাবে আসেন । সে সময় এই নৃত্যশৈলী রসিক মহলে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল এবং কলা মণ্ডলম সমস্ত পৃথিবীতেই প্রায় এই নৃত্যধারা সম্পর্কে রসিক মনকে আপ্লুত করতে পেরেছিল । পরবর্তীকালে উদয়শংকর এবং গোপীনাথের মত শিল্পীরা উত্তরভারতেও এই নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে শান্তি নিকেতনে এবং আনমোড়াতে কথাকলি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় , শান্তারাও দক্ষতার সঙ্গে এই নৃত্য আয়ত্ব করে নেন । এই সময় তিনি মোহিনী আট্টমও আয়ত্ব করেন । এবং পরবর্তী কালে তিনি যখন শিল্পী হিসাবে মঞ্চে আবির্ভূত হন তখন নৃত্যরসিক মহলে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন । তিনিই একমাত্র ভরতনাট্যম শিল্পী যিনি যাকে নাট্য সমালোচকরা 'আধুনিক মানবিকা আখ্যা দিয়েছিলেন ।

এইভাবে ভারতীয় নৃত্যকলার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অবক্ষয়ের অন্ধকার থেকে আবার সগৌরবে নৃত্য ইতিহাসে ফিরে আসে । এই তিনটি ধারা যথাক্রমে মনিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম । ১৯৪০ সালে কথক ধারার ক্ষেত্রে 'মাদাম মেনকা ' মঞ্চে আসেন

মাদাম মেনকা কথক নৃত্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই নৃত্যশৈলীকে দক্ষতার সঙ্গে রপ্ত করেন এবং পরবর্তীকালে খাণ্ডালায় তিনি কথক নৃত্য শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সময়ই নৃত্য মঞ্চে আবির্ভূত হন রামগোপাল, মৃনালিনী সারাভাই প্রমুখ ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা। এইভাবেই প্রায় অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া ভারতীয় নৃত্যকলা এ-মেই বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রসারতা লাভ করে এবং অতীতের জনপ্রিয়তাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা শুধু বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা কোলকাতা এই সব বড় শহরগুলিতেই ঘটেনি সারা দেশেই এই জনপ্রিয়তার দোলা পৌঁছে গিয়েছিল।